

॥ ভাগনাদিহির মাঠে ॥

ভাগনাদিহির মাঠে

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা-১২

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

প্রকাশক
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

এক টাকা বারো আনা

গ্রন্থকারের বক্তব্য

আগে শুধু রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লিখেছি, কখনো উপন্যাস লিখিনি। তাই এ আমার উপন্যাস লেখায় হাতে-খড়ি বলা চলে। সাঁওতাল বিদ্রোহের চমকপ্রদ ঘটনাবলী অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধরনে একটা কিছু দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি।

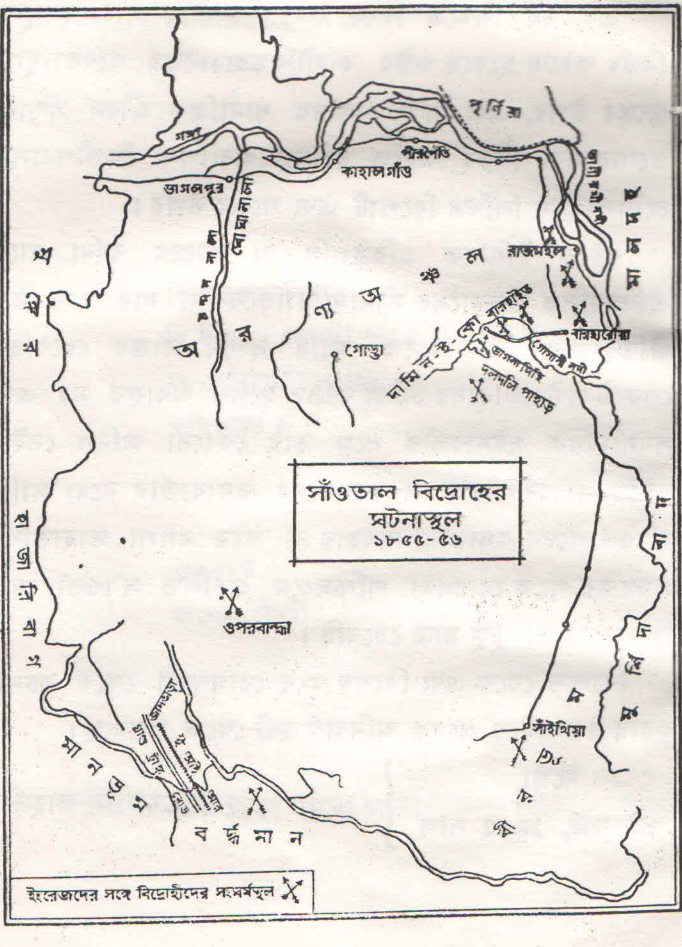
এই বই লিখতে গিয়ে তথ্যাদির জন্য আমাকে মূলত নির্ভর করতে হয়েছে ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্তের গবেষণামূলক গ্রন্থের উপর, এবং সাঁওতালদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে তথ্যের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত রিপোর্ট এবং পত্রের উপর।

বইয়ে উল্লিখিত চরিত্রগুলি বা তাদের বর্ণনা যাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সীমানা ছাড়িয়ে না যায় তার জন্য ঐতিহাসিক কাঠামোকে আমি সম্পূর্ণ বাস্তব রেখেছি। লেফটেনাণ্ট জোন্‌সের চরিত্র কল্পিত হলেও অবাস্তর নয় এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোনো অমিল নেই। বইয়ে ব্যবহার করা সাঁওতালদের কথাবার্তার মধ্যে আমি সাঁওতালদের কথ্যভাষা ব্যবহার না করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের পক্ষে বোধগম্য পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত সাঁওতালদের কথাবলার ভঙ্গিটুকু মাত্র রেখেছি।

বিদেশে থেকে এবং বিশেষ করে রোগশয্যা থেকে রচনা করার জন্য বইয়ে অনেক অনিবার্য ত্রুটি থেকে গিয়েছে।

মস্কো,
৬ই মার্চ, ১৯৫৫ সাল

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী



সাঁওতাল বিদ্রোহের
ঘটনাস্থল
১৮৫৫-৫৬
গঙ্গা
পূর্ণিয়া
পীরপৈন্তি
কাহালগাঁও
ভাগলপুর
রাজমহল
বারহারোয়া
গোদ্দা
ওপরবান্ধা
সাঁইথিয়া
বর্দ্ধমান
ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষস্থল

মুখবন্ধ

সাঁওতাল অভ্যুত্থানের পর একশো বছর সম্পূর্ণ হয়েছে এই বছরেই প্রথম বর্ষায়,—তিরিশে জুন তারিখে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পনেরো থেকে বিশ হাজার শহীদের স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে। এই বিদ্রোহের নেতারাই ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেরও আগে থেকে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে সংগ্রাম ঘোষণা করেন, এঁরাই সর্বপ্রথম নিজেদের এলাকায় সাঁওতাল-বাঙালী-বিহারী সমস্ত গরীব মেহনতী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলেন এবং ইংরাজ রাজত্বের সামগ্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যান। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের দমননীতি ও ভেদনীতি সত্ত্বেও এবং খৃষ্টান মিশনারিদের প্রচার ও সংগঠনের বেড়াজালের ভিতর থেকেও বারবার বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়েছে। সেদিনকার বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা বৃটিশ ফৌজের ঘেরাও অতিক্রম করে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানেও পরবর্তী যুগে তারা সংগ্রামের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখেছে। উত্তরবঙ্গে ১৯২০-২১ সালে ও ১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় আন্দোলনে এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের ষাটলক্ষ ভাগচাষীর মিলিত আন্দোলনের মধ্যে সাঁওতাল কৃষকদের অবদান অপর কারুর চেয়ে কম নয়। আদিবাসীদের নিজস্ব বাসভূমিতেও আন্দোলনের ঐতিহ্য হাজার বিভেদচেষ্টা সত্ত্বেও বেঁচে আছে।

গত একশো বছরে আদিবাসীদের পুরনো বাসভূমিতে একটা মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে। এই অঞ্চলই হয়ে উঠেছে

ভারতবর্ষের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খনি ও শিল্পাঞ্চল—এইখানেই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লাখনি এলাকা, রানীগঞ্জ ও ঝরিয়া ; এইখানেই জামশেদপুর, বার্নপুর, হীরাপুর, কুলটি ও চিত্তরঞ্জনে লোহা, ইস্পাত ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের মূল ঘাঁটি ; এইখানেই ভারতের প্রায় সমগ্র অভ্র-সম্পদ এবং লাক্ষা সংগ্রহের কেন্দ্র ; এইখানেই দামোদর পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে জলবিদ্যুৎ সরবরাহের বিরাট বিরাট কেন্দ্র গঠনের চেষ্টা চলেছে।

একশো বছর আগে মেহনতী মানুষের ঐক্যের মানে ছিল গ্রামে ও গঞ্জে কৃষকের সঙ্গে কুটিরশিল্পীর ঐক্য—সমস্ত আদিবাসী-বাঙালী-বিহারী মেহনতী মানুষের ঐক্য। আজকের দিনে এই এলাকায় মেহনতী মানুষের ঐক্যের তাৎপর্য অনেক বেশি গভীর। এই ঐক্যও শ্রমিক এবং কৃষকের ঐক্য কিন্তু এখনকার শ্রমিক প্রধানত আর কুটিরশিল্পী নয়,—এখনকার শ্রমিক হচ্ছে মূলত খনি ও বৃহৎ শিল্পের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক। এই শ্রমিকশ্রেণী গত একশো বছর ধরে দেশবিদেশের শ্রমিক আন্দোলন থেকে সার্থক আন্দোলনের পথ চিনতে শিখেছে,—এরা শুধু নিজেদের আংশিক দাবি নিয়েই লড়ে না, দেশের সমস্ত মানুষের ন্যায্য দাবির আন্দোলনে এরা অগ্রণী এবং নিজেদের আংশিক দাবির সংগ্রামের পিছনেও ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন সংগঠিত করে।

তাই আজ মেহনতী মানুষের সংগ্রামের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে গিয়ে বারবার মনে পড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের

দিনগুলি। সঙ্গে সঙ্গে কামনা করি আদিবাসী-বাঙালী-বিহারী ও অন্যান্য সব জাতির মেহনতী মানুষের ঐক্য সমস্ত বিভেদ-চেষ্টা কাটিয়ে অটুট থাকুক। সাঁওতাল বিদ্রোহের বিশ হাজার শহীদের অমর স্মৃতি উদ্‌যাপনের একমাত্র পথ হচ্ছে এই ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে জমি, রুজি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইকে সফল করা ঃ

রবীন্দ্রনাথ এই মেহনতী মানুষেরই অবশ্যম্ভাবী জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে !

... .

দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে ॥

ছোট্ট একটু ইতিবৃত্ত

কাটোয়া ছাড়িয়ে আরো কিছুদূর উত্তরদিকে চলতে আরম্ভ করলে ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড়ে পাই মাত্র একফালি পলিমাটির জমি। আরো পশ্চিমে গেলে পাই কাঁকরে ভর্তি উঁচুনিচু শক্ত মাটি এবং তার পরেই ছোট বড় পাহাড়। রাজমহল পাহাড় ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে,—আরো পশ্চিমে দেড়শো বছর আগে পর্যন্ত ছিল আদিম অরণ্য। এই বনভূমি কোথাও শুধুমাত্র শালগাছে ভর্তি, কোথাও শালগাছের সঙ্গে মিশে আছে শিমূল, পলাশ, আম, মহুয়া এবং আরো রকমারি ছোটবড় গাছ। এইখান থেকে শুরু করে এই বনভূমি বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশ জুড়ে উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ পর্যন্ত দক্ষিণদিকে গিয়েছে আর পশ্চিমদিকে মুঙ্গের ও হাজারিবাগ জেলার দক্ষিণাংশ ছুঁয়ে সমস্ত ছোট-নাগপুর অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। এই অঞ্চলেরই মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমেছে ঝরণা এবং নদী,— বর্ষায় তারা ফুলে ফেঁপে উঠে দুকূল ভাসিয়ে চলে এবং শীতের সময় থেকেই নদী ক্ষীণ হয়ে পড়ে কিংবা বালির নীচে লুকিয়ে থাকে। এই

সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এদের বাসভূমি থেকে উ থাকল। গ্রামচ্যুত আদিবাসীরা দলে দলে জীবি বাঙালীদের বাসভূমির দিকে কিংবা গভীরতর যাত্রা শুরু করল।

এই যুগেই যাযাবর এবং ক্ষুব্ধ আদিবাসীদের শান্ত করবার জন্যে বড়লাট বেন্টিঙ্ক রাজমহলের জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে বসবাস ক সাঁওতালদের আহ্বান জানালেন। কিছু কম বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার এই অংশটার নাম দেওয়া হল দামিন্-ই অঞ্চলের পাঁচশো বর্গমাইল শুধু পাহাড়। এ কেটে ৮০ হাজারের মত যাযাবর সাঁওতাল মধ্যেই হাজার দেড়েক বস্তি প্রতিষ্ঠা করল। অ এই অঞ্চলে জঙ্গল ও পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বাঙালী, বিহারী ও পাহাড়িয়ারা বসবাস করে এ এখন হয়ে উঠল সাঁওতালদের প্রতিবেশী।

বিস্তীর্ণ এলাকায় স্মরণাতীত কাল থেকে সাঁওতাল প্রভৃ
আদিবাসীরা বসবাস করে আসছে। কিছুটা শিকার ক
এবং কিছুটা চাষবাস করে এরা জীবনযাপন করত। এ
গ্রামগুলি ছিল সজ্ঘবদ্ধ এবং জীবনযাত্রা প্রাচুর্যপূর্ণ না হ
অরণ্যজীবনের মতই শক্ত-সমর্থ এবং অবাধ ছিল।

পাঠান এবং মোগলেরা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে গঙ্
উত্তরদিক ধরে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের স্বল্প-পরি
পলিমাটি অঞ্চল দিয়ে। তারা এই বিশাল বন এবং পাহা
দেশের স্বাভাবিক জীবনকে খুব বেশি আঘাত দিতে পারে
কখনো কখনো তাদের সৈন্যদল পাহাড়ে নদীর ধার দিয়ে কি
জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে এগিয়েছে বটে, কিন্তু সৈন্য
চলে যাবার পর আদিবাসীদের জীবনযাত্রা পুরনো খা
বয়ে চলেছে।

ইংরেজ এসে এই অঞ্চলে প্রথমেই দেখতে পেল অফু
কাঠের সম্পদ। তারপর অনুসন্ধানকারীরা বিস্তীর্ণ এলা
জুড়ে কয়লাখনি এবং লোহা, তামা, লাক্ষা ও অভ্রের খোঁ
পেল। আঠারো শতকের শেষ দিকেই এই অঞ্চ
জঙ্গলগুলো আদিম অধিবাসীদের অধিকারের কোনো তোয়া
না রেখে সায়েব ও বাঙালী জমিদারদের সম্পত্তি হয়ে গে
উড়িষ্যার বিভিন্ন এলাকা থেকে শুরু করে ধলভূম, মান
ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, বীরভূম, বাঁকু
মেদিনীপুর—সমস্ত এলাকাতেই আদিবাসীরা নিজে
অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। ছোট বড় অসংগঠিত অস

সরকারের মধ্যে দিয়ে এদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ চলতে থাকল। স্থানচ্যুত আদিবাসীরা দলে দলে জীবিকার সন্ধানে বাঙালীদের বাসভূমির দিকে কিংবা গভীরতর অরণ্যের পথে যাওয়া শুরু করল।

এই যুগেই যাযাবর এবং ক্ষুব্ধ আদিবাসীদের কোনোরকমে শান্ত করবার জন্যে বড়লাট বেন্টিঙ্ক রাজমহলের পশ্চিমদিকে জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে বসবাস করবার জন্যে সাঁওতালদের আহ্বান জানালেন। কিছু কম দেড়হাজার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার এই অংশটার নাম দেওয়া হল দামিন্-ই-কো। এই অঞ্চলের পাঁচশো বর্গমাইল শুধু পাহাড়। এইখানে জঙ্গল কেটে ৮০ হাজারের মত যাযাবর সাঁওতাল ১৮৫১ সালের মধ্যেই হাজার দেড়েক বস্তি প্রতিষ্ঠা করল। আগে থেকেই এই অঞ্চলে জঙ্গল ও পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কিছু সংখ্যক বাঙালী, বিহারী ও পাহাড়িয়ারা বসবাস করে এসেছে; তারা এখন হয়ে উঠল সাঁওতালদের প্রতিবেশী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাগলপুরগামী লুপ লাইনে বারহারোয়া আজকের দিনে একটা নামকরা রেলওয়ে স্টেশন.। এখান থেকে বারো-তেরো মাইল পূবদিকে বারহাইত-এ দামিন-ই-কো এলাকার সুপারিন্টেডেণ্ট পণ্টেট সাহেবের আপিস। বারহাইত-এর পাশ দিয়ে গিয়েছে গোমানী নদী আর দক্ষিণদিকে কিছুটা দূরে দল্‌দলি পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বারহাইত আর দল্‌দলি পাহাড়ের মাঝখানে বড় রকমের সাঁওতাল বস্তি ভাগনাদিহি। এখানে দু'শো ঘরের বেশি সাঁওতালের বাস।

শরৎকালের বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এল। দল্‌দলি পাহাড়ের দিক থেকে এরই মধ্যে গরু, মোষ ও ছাগল চরিয়ে সাঁওতাল বালকবালিকারা গাঁয়ের দিকে ফিরতে শুরু করেছে। মাঠে ফসলকাটা এখনো আরম্ভ হয় নি, সাঁওতাল কৃষকেরা এখানে ওখানে নিজের নিজের ক্ষেতে খুঁটিনাটি কাজকর্ম করছে। গোমানী নদীর বালি খুঁড়ে খাবার জলের কলসী মাথায় করে সাঁওতাল মেয়েরা ঘরে ফিরছে, তাঁদের স্বল্প আচ্ছাদিত দেহ থেকে নিটোল স্বাস্থ্য ঠিকরে পড়ছে, মাঝে মাঝে সঙ্গিনীদের সঙ্গে কথাবার্তায় তাদের কলহাস্যও শোনা যাচ্ছে। মাঠ থেকে গান শোনা যাচ্ছে।

শরৎকালের একটি শান্ত সুন্দর পরিবেশ সমস্ত গ্রামটিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

নদীর দিক থেকে গ্রামে ঢুকতে হলে সর্বপ্রথমে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘরগুলি নজরে পড়ে, সেগুলি হচ্ছে সিধু ও কান্হুর বাড়ি। এদেশে গ্রামের মোড়লদের বলে "মাজি", কয়েকখানা গ্রাম বা গোটা থানা এলাকা জুড়ে সর্দারকে বলে "পরগণাইত", তার চেয়েও বড় মোড়ল কখনো কখনো দেখা যায়—তাকে এরা বলে "ঠাকুর"।

সিধুরা বংশানুক্রমে অনেক বস্তির মোড়ল। সিধুর বাবাই মেদিনীপুরের পশ্চিম থেকে উৎখাত যাযাবর জ্ঞাতিগুষ্ঠি ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে এইখানে এসে গ্রাম পত্তন করে। জঙ্গল কেটে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, মাটি থেকে কাঁকর ও পাথর সরিয়ে তারা চাষের জমি তৈরি করে। বাবা মারা যাবার পর সিধুই এই গ্রাম এবং আশেপাশের বহু গ্রামের মোড়ল।

আজ সিধু ক্ষেতের কাজে যায় নি। তার বাড়িতে বহু লোকের আনাগোনা চলছে। গ্রামের শান্ত আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিধুর বাড়ির ভিতরকার ছবি। আগামীকাল পণ্টেট সাহেবের কুঠিতে সাঁওতাল এলাকার সমস্ত পরগণাইতদের দরবার ডাকা হয়েছে, দূর অঞ্চলের পরগণাইতরা আজ সকাল থেকেই বারহাইতের আশেপাশের গ্রামে, বিশেষ করে ভাগনাদিহিতে এসে পৌঁছেচে।

সিধুর বাড়ির সামনের দিকে মহুয়া গাছের তলাটি মাটি ও গোবর দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লেপা। সেইখানেই সিধু বসে অন্যান্য এলাকার পরগণাইতদের সঙ্গে কথা বলছে।

এখন তার সামনে বসে আছে লছিমপুরের পরগণাইত বীরসিং এবং হাটবান্দার দোমন মাজি। বীর সিং এবং দোমন দুজনেই এখনো যুবক, বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি। বীর সিং একটু বেশী উত্তেজিত : "সিধু, তুর খবর আওর হামার খবর এক, পন্টেট সায়েবটো দশগুণ খাজনা বঢ়াতে চায়।"

সিধু বলল, "সেরেফ খাজনা লয়—সায়েবলোগ হামাদের মাফিক মাজি-পরগণাইতদের ইজ্জৎ খাটো কোরতে আওর হামরার সোমাজ ভি তুড়তে চায়।"

দোমন জিজ্ঞেস করল, "তুর বাতটা হামি বুঝলম না।"

সিধু উত্তর দিল, "হামরার লুকেরা আদালতে লালিশ কোরে না, সোমাজের বিচারটো মেনে লেয় ; বস্তির খাজনা হামরা মাজি মারফৎ ভেজি, জনে জনে কাছারিতে ভেজি না। সায়েবলোগ আদমি পিছু খাজনা ঠিক করে লিতে চায় আওর সোমাজটো তুড়ে আদালতের বিচার কায়েম কোরতে চায়। উয়ারা হেইটা কোরলে পোর ফির ভি হামরার জমি-জেরাত, ঘর-সন্‌সার বরবাদ হোবে, ফির ভি হামাদের পথে দাঁড়াতে হোবে।"

বীর সিং বলল, "হেইটা হইতে দিবক লেই। আজ সাঁঝ থেকেই হামি আওর ডোমন ভিন গাঁয়ের পরগণাইতদের সাথে বাতচিত কোরবে। কালকের দরবারে কুছুতেই সায়েবলোগদের মতলব হাসিল করতে দিবক লেই।"

সিধু একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, "তুই কি সমঝেছিস পন্টেট হামরার গলা লিবেক? উ সেরেফ হুকুমটো শোনাবে

লিবেক। জঙ্গল কাটনু, গাঁও গড়নু, পন্দর সাল একটু জিরিয়ে লিছি, ফির উরা হামাদের কামড়াতে চায়। চোল, কাল দেখি কি চায় উরা।"

বীর সিং ও ডোমন সিধুকে নমস্কার করে বিদায় নিতে না নিতেই সিধুর পাশে এসে বসল তার বউ লখিয়া। সিধুর মাথার রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, "দিনভোর তুই সল্লাই কোরলি, এখুনো তুর ভুরু কুঁচকে রইছে। তুর গোস্সা দেখিয়ে হামার বড় ডর লাগে। ব্যাপারটা কি হামাকে সমঝা।"

সিধু উঠে দাঁড়াল এবং লখিয়ার হাত ধরে তাকে পাশে দাঁড় করাল। তখন গোমানী নদীর ধারে শালগাছের আড়ালে সবেমাত্র সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেই দিকে তাকিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে সে লখিয়াকে বলল, "তুর মনে আছে বিশ সাল আগে যেখুন হাঁটতে হাঁটতে হায়রাণ হইয়ে বাপের সাথে গোমানীর ধারে এলম?"

লখিয়া হেসে বলল, "হেইটো কি ভুলবার বাত? তুর কাঁধ ধরে গোমানীর ধারে পৌঁছলম তবে তো হামার জান বাচল। বুদা আমগাছটোর লিচে হামি বোসলম, তুই হামার লেগে বালি খুঁড়িয়ে জল আনলি।"

সিধু গম্ভীরভাবে বলল, "ফির মালুম হোচ্ছে পথে দাঁড়াতে হোবে। হামি বেশ সমঝে লিয়েছি—হেইটোই সায়েবলোগের মতলব।" তারপর পরম স্নেহভরে লখিয়ার কাঁধ জড়িয়ে সিধু বলল, "ইবার কিন্তুক গাঁও, ঘর ভাঙতে দিবক লেই।"

তখন ভরসন্ধ্যেয় গরুমোষ নিয়ে সিধুর জোয়ান ছেলে কাণ্ডলে এবং কিশোরী মেয়ে সুখিয়া ঘরে ফিরছে। তারা গরু-মোষ বেঁধে মা-বাপের পাশে এসে দাঁড়াল। মাঠ থেকে সিধুর ভাই কান্হু, তার বউ মনিয়া এবং দুই ছেলে ভজা ও নন্দু হাসিহল্লা করতে করতে এসে পৌঁছল। সিধু কান্হুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কানহু, আজ হামরার লাচ হোবে, তুরা সোব তেয়ার হ, হামি মাদলটো বার করি।"

সিধু মাদল নিয়ে মহুয়া গাছতলায় এসে দাঁড়াল। এখন তাকে দেখলে মনে পড়ে এই অরণ্য এলাকার সুদৃঢ় শাল-গাছের কথা। সিধুর শুধু কোমরে জড়ানো একটুকরো ধুতি এবং অনাবৃত হাত পা ও বুকের মাংসপেশীগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে। সিধুর মধ্যে জেগে উঠছে আদিম আরণ্য জীবন, আত্মরক্ষার সুদৃঢ় ইচ্ছায় পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। মাদলে ঘা দিতেই বেজে উঠল লড়াইয়ের নাচের বোল। তাকে ঘিরে দাঁড়াল কানহু এবং সিধু কানহুর ছেলেমেয়েরা। নাচ শুরু হয়ে গেল। হাজার হাজার বছর ধরে এই নাচ তারা নেচে এসেছে ; এই নাচের মধ্যে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার বছর ধরে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের স্মৃতি,—গ্রামের প্রান্তে, নদীর ধারে, জঙ্গলের অন্ধকারে, পাহাড়ের গুহায় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দীপনা এ নাচে প্রাণবন্ত। নাচের হুঙ্কার ও দ্রুত লয় মাদলের বোলের সঙ্গে মিশে সমস্ত আবহাওয়াকে মন্ত্রের মত বদলে দিল। আশ-পাশের ঘর থেকে জোয়ানেরা ছুটে আসতে লাগল।

নাচ যখন শেষ হল তখন কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠেছে। নাচ থেমে যাওয়ার অনেক পরেও ভাগনাদিহির ঘরে ঘরে জোয়ানদের রক্তপ্রবাহে সেই নাচের রেশ রয়ে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্টেট সায়েবের হেড কোয়ার্টার বারহাইত বেশ মস্ত বড় গ্রাম। এখানে পণ্টেট সায়েবের আমলা এবং পাইক বরকন্দাজ ছাড়াও প্রায় একশো ঘর বাঙালী ও বিহারী ব্যবসায়ী ও মহাজনের বাস। তাছাড়াও বিভিন্ন পাড়ায় বাস করে অনেক ঘর কারিগর,—কামার, কুমোর, মুসলমান জোলা প্রভৃতি। পণ্টেট সায়েবের কুঠিটা বাংলো ধরনের, দেওয়াল পাকা এবং ছাদ ছাওয়া। বাংলোর এক ধারে বেশ খানিকটা আমবাগান আছে, পণ্টেট সায়েব মুর্শিদাবাদ থেকে কলম আনিয়ে এই বাগান তৈরি করিয়েছেন। বাংলোর দক্ষিণদিকে বেশ বড় একটা পুকুর,—পণ্টেট সায়েবের আমলেই কাটানো। পুকুরের ওপার থেকে আরম্ভ হয়েছে পণ্টেট সায়েবের আলুর ক্ষেত। এই সবেমাত্র আলুর বীজ বসানো শেষ হয়েছে, মাঠে এখনো ক্ষেতমজুরেরা পাট করছে। পুকুরের পাড়ে সারি দিয়ে পেঁপে গাছ বসানো হয়েছে।

এখনো সূর্যের তেজ প্রখর হয়নি, সবেমাত্র সকাল নটা। পণ্টেট সায়েবের বাংলোর সামনে খোলা জায়গায় অনেক লোকজন মিলে সামিয়ানা টাঙাচ্ছে। বিকেলে এখানে পণ্টেট সায়েব সাঁওতাল মোড়লদের নিয়ে দরবার করবেন।

পণ্টেট সায়েবের বৈঠকখানা। একদিকে টেবিলের তিনধারে কয়েকখানা চেয়ার। বড় গদি আঁটা চেয়ারে পি[ঠ] হেলান দিয়ে পণ্টেট সায়েব বসে। পেছনের জানলা পুকুরে[র]

দিকে খোলা। তবু একজন চাকর সকাল থেকেই টানা পাখার দড়ি টানছে। পন্টেট সায়েবের ডান পাশে বসে আছেন ভাগলপুর এবং রাজমহলের হাকিম, আর বাঁদিকের চেয়ারে পাকুড় রাজার দেওয়ান এবং একজন মিলিটারী সায়েব। গতকাল সন্ধ্যার সময়ে ভাগলপুর থেকে শতখানেক সিপাই সমেত মিলিটারী সায়েবটিকে আনানো হয়েছে। এরা সকালবেলা একবার হাটতলায় কুচকাওয়াজ করেছে এবং সাঁওতালদের দরবার হবার সময়ে আবার জমকালোভাবে কুচকাওয়াজ করবে বলে ঠিক করা হয়েছে।

পন্টেট সায়েব পাকুড়ের দেওয়ানকে বললেন, "জানো রায়, আমার দরবারের পনেরো আনাই হল এই কুচকাওয়াজ। এই কুচকাওয়াজ থেকেই মোড়লরা বুঝে নেবে যে ইংরেজের হুকুম মানা ছাড়া গতি নেই।"

দেওয়ান দুহাত কচলে গদগদ স্বরে জানালেন, "একথা তো একেবারে সত্যি। আর জানেন স্যর, ওদের ওই সমাজের বাঁধনের দরুন ওরা শুধু আমাদেরই নয়, আপনাদের কাছা-রিকেও এড়িয়ে চলে।"

পন্টেট সায়েব আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "সমাজ-টমাজ এবং মোড়লী ওসব বেশীদিন আর চলবে না। লুপ লাইনের জরিপের কাজ শেষ হতে আর বাকি নেই, দু-তিন বছরের মধ্যেই আমাদের এই বারহারোয়া দিয়ে রেলগাড়ি চলতে শুরু করবে। পশ্চিমদিকে বর্ধমান, রানীগঞ্জ, আসানসোল দিয়ে রেলগাড়ি চলতে আর বিশেষ দেরি নেই।

ওদিকে কয়লার খনি আর আমাদের এদিকে বাজারী ফসল...”

কথা বলতে বলতেই পন্টেট সায়েব চেঁচিয়ে উঠলেন, “বেয়ারা বেয়ারা...” বেয়ারা সেলাম করে ঘরে ঢুকতেই পন্টেট সায়েব একটু রুক্ষভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, “কই, মহাজনরা এখনো তো পৌঁছল না।”

বেয়ারা আবার সেলাম করে বলল, “হুজুর, তারা আপনার ডাক শুনলেই আসবে বলে বাইরে অপেক্ষা করছে।”

পন্টেট সাহেব বললেন, “শীগগির ডেকে আন তাদের।”

বেয়ারা বাইরে গিয়ে যাদের ডেকে আনল তাদের মধ্যে দুজন হচ্ছে লিটিপাড়ার বিহারী মহাজন ঈস্‌রী ভকত এবং তিলকী ভকত, আর বাকি তিনজন বারহাইতের সব চাইতে ধনী বাঙালী ব্যাপারী, তারা মহাজনও বটে।

সায়েবকে সেলাম করে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পন্টেট সায়েব আঙুল দেখিয়ে জাজিম বিছানো ঘরের মেঝেতে তাদের বসতে বললেন। ঈস্‌রী এবং তিলকীর পরনে ধুতি এবং হাতকাটা ফতুয়া, মাথায় একটুকরো পাগড়ীর মত। তাদের মেদবহুল শরীর যেমন ফতুয়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তেমনি তাদের চোখ থেকে ধূর্ততা ঠিকরে পড়ছে। বারহাইতের সব চাইতে বড় ব্যাপারী দিগম্বর দাসের একহারা চেহারায় জড়ানো বৈষ্ণবের নামাবলী, কপালে তিলক আঁকা, গলায় কণ্ঠী এবং হাতে নামজপের মালা—দেখলে হঠাৎ ব্যাপারী বা মহাজন বলে মনে হয় না। অপর দুজন বাঙালী

ধুতি চাদর পরে এসেছে, তাদের চেহারাতে মহাজনের রূঢ়তা ও ধূর্ততার ছাপ বেশ স্পষ্ট।

পণ্টেট সায়েব অপর সকলকে উপেক্ষা করে দিগম্বরকেই ডেকে বললেন, "কই, সরষের চাষ তো তেমন বাড়ছেনা? অন্যান্য বাজারী ফসলের চাষের কথা কি ভাবছেন? আপনার তো অনেক খাতক!"

দিগম্বর জবাব দেবার আগেই ঈস্‌রী ভকত বলে উঠল, "হুজুর আর সাঁওতালদের পরগণাইত লোগকে বাস্তে কুছু ভি কোরা যায় না। হামরা খাতকদের হুকুম করি এক আওর পরগণাইত লোগ উনগো দুসরা হুকুম দেয়। ওরা সির্ফ চাবল আওর মকাই লাগায়।"

পণ্টেট সাহেব একটু উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বাংলোর বাইরে একটু দূরে যেখানে মিলিটারীরা ছাউনী ফেলেছে সেখানে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। পণ্টেট সায়েব বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "ওসব সেকেলেপনা চলবেনা। এখানে পশ্চিম দিকের রেললাইনের ধারে ধারে হবে কয়লার খনি, গড়ে উঠবে নতুন শহর আর লুপ লাইনের ধারে ধারে গড়ে উঠবে চালানী বাজারী ফসলের উপযোগী বড় বড় হাট বাজারের এলাকা।"

দিগম্বর সমানে নামজপের মালা ঘুরিয়ে চলেছে, এখন তার তিলক আঁকা মুখে খুব অল্প একটু হাসির আভাস দেখা গেল।

দিগম্বর এই বছরেই কাথিকুণ্ডের গদি থেকে হাজার মণ

আর বারহাইতের গদি থেকে পাঁচশো মণ সরষে কলকাতা
চালান দিয়েছে ; সে ধীরে ধীরে বলল, "সবই হবে তবে কি
সময় লাগবে।"

ঈস্‌রী খুব তড়বড় করে বলে উঠল, "হুজুর, গর্মীর দি
ওরা জঙ্গলে দল বেঁধে শিকার করে আর জঙলী গাছসে ফল
খায়, কুছুতেই হামাদের কাছে কর্জা করতে চায় না। এ
বন্ধ করতে হোবে।"

পণ্টেট সায়েব আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে
"এবারকার ফরমানে মাজি পরগণাইতদের মোড়লী শেষ হ
তারপর সকলেই আমাদের মর্জিমত চলবে। তোমরা বিকেলে
দরবারে নিশ্চয়ই হাজির থাকবে।"

পণ্টেট সায়েব ইঙ্গিত করতেই ব্যাপারীরা সেলাম ক
বিদায় নিল।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্টেট সায়েবের বাংলো
আরও কয়েকজন সায়েব অতিথি হাজির হলেন,—ক
সায়রের নীলকুঠির চার্লস মাশেক ও তার ভাই, বারহারো
রেললাইন জরীপের কাজে ব্যস্ত কয়েকজন সায়েব প্রভৃ
আজ দুপুরবেলায় সায়েবের কুঠিতে খানাপিনার বেশ ঘ
ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হব-হব করছে। আমগাছগুলে
ছায়া বেশ লম্বা হয়ে দূর পর্যন্ত পড়েছে। সাঁওত
পরগণাইতরা দুজন চারজন করে আমগাছতলায় জ
হচ্ছে। দরবারে ডাক পড়লে পরে তারা সামিয়ানার দি
আসবে।

আমবাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সিধু ও কানহুর সঙ্গে এসে মিলল তাদের আরও ছু'ভাই চাঁদ এবং ভৈরব। এরা থাকে শিমূলচাপে, সবেমাত্র এসে পৌঁছল। এখনো কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে বীরসিং এবং ডোমন হাজির হল। বীরসিং সিধুর পাশে বসেই বলতে আরম্ভ করল, "জানিস সিধু, যে দিকুটো পণ্টেট সায়েবের টানা পাখা টানে, সে লিজের কানে শুনেছে ; পণ্টেট সায়েব যেখুন হুকুমটো পড়িয়ে শুনায় তেখুন দিকু সিখানেই ছিল। তুই ঠিক বুলেছিলি। উরা হামাদের সমাজটো তুড়তে চায়।"

ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রিত মাজি ও পরগনাইত সাঁওতালেরা সবাই জমায়েত হল। সিধু বীরসিংকে বলল, "তুই সোবাইকে খবর দে যে আজ হামরা কুনো বাগড়া মারামারি করবক লেই, সাফ জবাব ভি আজ দিবক লেই, সেরেফ বুলবো সোমাজের রায় লিয়ে পরে খবর দিবক।"

ইতিমধ্যেই পণ্টেট সায়েবের কাছারির পাইক বরকন্দাজেরা ছড়ানো লোকজনকে সামিয়ানার ভিতরে যাবার জন্য ডাকা-ডাকি শুরু করেছে।

দরবারের জায়গাটা বেশ জাঁকালো রকমে সাজানো হয়েছে। পাতা ও ফুল দিয়ে বাহার করে কয়েকটা গেট, সায়েবরা যেদিকে বসবে সেদিকে সাজানো টেবিল-চেয়ারের চারদিকে ফুলগাছের টব। সামনের দিকটায় ধবধবে জাজিমের ওপরে ইতিমধ্যেই নিমন্ত্রিত, ব্যাপারী ও মহাজনেরা এসে জাঁকিয়ে বসেছে। সাঁওতালরা ধীরে ধীরে সামিয়ানার মধ্যে

আসছে। পুকুরধারে সিপাইদের তাঁবু থেকে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। সায়েবরা দল বেঁধে বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামিয়ানার তলায় চেয়ারে বসল। পণ্টেট সায়েব মিলিটারীর কর্তাকে ইঙ্গিত করতেই তিনি সিপাইদের তাঁবুর কাছে গিয়ে অর্ডার দিলেন। সিপাইরা বন্দুক নিয়ে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল। একশো সিপাই মিলিটারী ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে সামিয়ানার পাশ দিয়ে মার্চ করে চলল। সামিয়ানা ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই তারা হুকুমমত থামল এবং একসঙ্গে একশো বন্দুক তুলে আকাশে ফাঁকা আওয়াজ করল। তারপর তারা ফিরে এসে সারিবদ্ধভাবে সায়েবদের পিছনে দাঁড়াল।

সাঁওতালদের সংখ্যাও হবে প্রায় একশো। দরবার মুখ্যত তাদের নিয়ে হলেও কেবলমাত্র তারাই কোনো বেশভূষা করেনি, বাকী নিমন্ত্রিত সকলেই উৎসবের সজ্জা করে এসেছে। সাঁওতাল জোয়ানদের মধ্যে অনেকেই পিঠে তীর ধনুক বেঁধে এসেছে, অনেকের হাতে ছোট লাঠি এবং বাকি সকলে একেবারে শুধু হাতে। তবু সাঁওতালরাই আজকের এই সভায় অত্যন্ত বিশিষ্ট। তাকিয়ে দেখুন সায়েবদের দিকে, তাদেরো লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। তাকিয়ে দেখুন সিপাইদের দিকে, তাদের রণসজ্জা এবং চেহারা এক সঙ্গে মিশে তাদেরও দর্শনীয় করেছে। এবারে তাকিয়ে দেখুন সাঁওতালদের দিকে,—এরা সম্পূর্ণ আলাদা। এরা যেন এইখানকার মাটি ফুঁড়ে শালগাছের মত দৃঢ় হয়ে বেড়ে

উঠেছে। এদের অনাবৃত বুকের দিকে তাকালে মনে হয় যে কালো পাথর কুঁদে এদের তৈরি করা হয়েছে। এদের দীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ হাত-পায়ের দিকে তাকালে শুধু শালগাছের কথাই মনে হয়। এদের বাবরিকাটা দীর্ঘ চুল এদের সহজ সৌন্দর্যবোধের ইঙ্গিত দেয়। আর সবচেয়ে অদ্ভুত এদের বড় বড় চোখের গভীর দৃষ্টি। এই দৃষ্টির মধ্যে আছে যুগ যুগান্তরের অরণ্যজীবনের গভীর রহস্য এবং অসীম ধৈর্যের ছাপ।

পন্টেট সায়েব লেখা হুকুম পড়ে শোনাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলেন, ঐ লোকগুলো কুচকাওয়াজে ভয় পাবার পাত্র নয়, একশো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের ওরা পরোয়া করে না।

চিৎকার করে হুকুম পড়ে শোনাতে শোনাতে পন্টেট সায়েবের মনে হল যে তিনিও আকাশে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করছেন।

হুকুম শুনিয়েই পন্টেট সায়েব উত্তেজিতভাবে সাঁওতালদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কিছু বলবার আছে? কে তোমাদের হয়ে বলবে?"

সাঁওতালদের ভিতর থেকে আওয়াজ এল: "সিধু!" "সিধু!"

সিধু ধীরে ধীরে সায়েবদের চেয়ারের দিকে এগিয়ে এল। মহাজনদের দিকে তাকিয়ে একবার তার কপাল একটু কুঁচকে উঠল, তারপর সে ধীরভাবে বলল, "সায়েব, তুর বাত শুনলম। গাঁয়ে ফিরে সোমাজের রায় নিয়ে হামরার বাত তুকে জানাব।"

সিধুর বক্তব্যের পরে সমস্ত সভার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। যারা সাজানো বক্তৃতা ঠিক করে এসেছিল তাদের কারো বক্তৃতা দেওয়া হল না। আগেকার নির্দেশমত মিলিটারী সায়েবের ইঙ্গিতে আবার ব্যাণ্ড বাজল, একশো সিপাই মার্চ করে গিয়ে আকাশে একশো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল এবং পণ্টেট সায়েব দরবার শেষ হয়েছে বলে জানালেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"মাহ-সিম" পরবের আর দুদিন মাত্র দেরি আছে। এবার ভালনাদিহিতে খুব ঘটা হবে—অনেক দূর দূর থেকে অতিথি এবং আত্মীয়স্বজন আসবে। আজ বারহাইতে হাটবার। ভালনাদিহি এবং আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক সাঁওতাল অনেকে গরুর পিঠে ফসল চাপিয়ে হাটের পথে চলেছে,—ফসল বিক্রি করে হাট থেকে তাদের অনেক কিছু সওদা করতে হবে, কারণ প্রায় সব বাড়িতেই কুটুম আসবে।

সিধুদের বাড়ির পাশ দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ ধরে টুনু ও মংরা সাঁওতাল চলেছে, তাদের সঙ্গে ফসল বোঝাই দুটো গরু। মংরা বলছে, "কুন বেপারীর কাছে তুই বেচবি? বস্তুরী দিয়া ওজন করলি কিন্তুক হামি মাল লিয়ে ফিরে এসবো—বিক্রি করবোক লেই।"

টুনু জিজ্ঞাসা করল, "তুই কেমনে বুঝবি ওজোন খাঁটি কি লেকি? তোর সঙ্গে কি খাঁটি ওজোন আছে?"

মংরা উত্তর দিল, "একটো আন্দাজ তো আছেরে বাপ্; বিশ ছটাককে একসের বলে চালিয়ে লিবে সে আমি মানবোক লেই।"

ইতিমধ্যেই সরু পথ ছেড়ে তারা নদীর ধারের চওড়া পথে এসে পড়েছে এবং হাটযাত্রী অনেক লোক তখন চলছে। ওদের কথা শুনে তিরভুবন মোড়লের ভাই বলল, "ঠিক বাত, আজ হামরা এতো লুক ফসল বেচবো, সাথে একটো পাকা

বাটখারা না নিলে চলবে কেনে! আওর হামাদের সাথে একটো মোড়ল ভি থাকা চাই।"

মংরা বলল, "মোড়ল হামরা বারহাইত গিয়ে ধরে লিব, সিধু, কানহু সোব আজ বারহাইতে। আওর কামারের ছুকানসে একটো পাকা বাটখারা লিতে হোবেক।"

সকলেরই মেজাজ একটু চড়া। মহাজনরা বারবার কেনার সময়ে কুড়ি ছটাক ওজনে একসের মাল কেনে আর আষাঢ় মাসে দাদন দেবার সময়ে তের ছটাক বাটখারাকে একসের বলে চালায়। সাঁওতালরা মহাজনদের মতই তাদের বাটখারা-গুলোকেও ঘৃণা এবং অবিশ্বাস করে। মহাজনরা নিজেদের মধ্যে বাটখারাগুলোর নাম দিয়েছে "কেনারাম" এবং "বেচারাম" আর সাঁওতালরা ঘেন্নার সঙ্গে বাটখারাগুলোর নাম রেখেছে মহাজনদের "বড়বৌ" আর "ছোটবৌ"। মংরা বয়সে ছোট হলেও তার মাথা বেশ খেলে, সে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, "বড়বৌটোর লিকুচি করতি হোবে।" অমনি সকলের মুখে মুখে সেই একই কথা ফিরতে লাগল, "বড়বৌটোর লিকুচি করতি হোবে।"

দিগম্বরের গদির সামনে মানুষ এবং মাল বোঝাই বলদের বেশ লম্বা লাইন। সেইখানেই সাঁওতাল জোয়ানেরা খুঁজে-পেতে সিধুর ভাই কানহুকে নিয়ে এসেছে। মংরার কাঁধে কাপড়ে জড়ানো কোম্পানীর ছাপমারা একসেরি বাটখারা। গদির সামনের দোকানের ঝাঁপ তুলতেই কানহু হাঁক দিয়ে বলল, "হেই বেপারী, হামাদের ফসল ওজোন করিয়ে লাও।"

দিগম্বর এইমাত্র খাতায় একশো আটবার হরিনাম লেখা শেষ করল। এখন কর্মচারীদের দিকে ইঙ্গিত করতেই, আট-দশ জনে গোটা আষ্টেক পাল্লা এবং বাটখারা নিয়ে হাজির হল। দোকানের কর্মচারী তিনু হাঁক ছেড়ে বলল, "কই, আন্ তোদের ফসল। একে একে নাম লেখা আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফসল ওজন করি।"

প্রথমেই মংরা তার ফসল নিয়ে হাজির হল। কর্মচারীরা চাউল বের করে পাল্লায় ঢালতে লাগল এবং ওজনের জন্যে কেনারাম বের করল। কানহু একটু হেসে দিগম্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখ্ বেপারী, ও বড়বৌ দিয়া ওজোন চলবেক লেই। আসল বাটখারায় ওজোন কোরতি হোবে। দে, মংরা, কুম্পানীর ছাপমারা আসল বাটখারা।"

দিগম্বর একবার কানহুর বিশাল দেহের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল সাঁওতাল জোয়ানদের দিকে, জপের মালা সমানে তার হাতে ঘুরছে। সে কিছুক্ষণ পরে বলল, "বেশ তোদের বাটখারা দিয়েই ওজোন হবে।"

সাঁওতাল জোয়ানেরা তখন খুব খুশি। দিগম্বর আপন খেয়ালে একটু হাসল, মনে মনে বলল, ঠিক ওজন করেও আমি তোমাদের একশো রকমে ঠকাতে পারি এবং ঠকাব।

কপালে মালা ছুঁইয়ে দিগম্বর একটু জোরে জোরে বার কয়েক হরিনাম করল। সমস্ত সাঁওতালদের মধ্যে একমাত্র কান্হই কোনো উল্লাস প্রকাশ করে নি।

ততক্ষণে সমস্তটা হাটে সোরগোল উঠেছে,—সকলেই

বলছে, "বড়বৌটোর লিকুচি কোরতি হোবে।" গ্রা
মহাজনের গদিতেই আজ খাঁটি ওজন করে মাল বি
হয়েছে। হাটতলার মাঝখানে সিধু এবং ত্রিভুবন মো
ঘিরে বেশ একটু ভিড়। এবার "মাঘ-সিমের" পরবে
ধনুকের প্রতিযোগিতা হবে। সেই কথাই সিধু ওদের
বলাবলি করছে। সিধুর হাতে গোটাকয়েক ঝকঝকে
তীর, কামারবাড়ী থেকে সে এইমাত্র এনেছে। বারহা
কিছু কামার ও কুমোর জোয়ান উপস্থিত ছিল।
জাতিতে বাঙালী; সাঁওতালরা বাঙালীদের বলে "দি
দুজন দিকু, কালু ও বেচু, এগিয়ে এল সিধুর সামনে।
কামারের ছেলে এবং কামারের কাজ করে, আর তী
বলে তাদের নামডাকও আছে। কালু সিধুকে জিজ্ঞাসা
"তোদের সঙ্গে তীর খেলায় আমাদের লিবি ?" ভিড়ের
থেকে একজন সাঁওতাল জোয়ান বলে উঠল, "তুরা তো
তুরা আবার সাঁওতালদের সাথে আসিস কেনে ?"

সিধু সাঁওতাল জোয়ানকে ধমক দিয়ে উঠল, "
দিকুদের সাথে হামাদের কুনো ঝগড়া লেই।"

কালুর দিকে তাকিয়ে সিধু হেসে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ,
তুই হামাদের পরবে, গাঁয়ের সোব গরীব দিকুদের ডেকে
এসবি। যে চায় সেই তীর খেলবে।"

কিছু গরীব বাঙালী চাষী আজ হাটে এসে ন্যায্য
ফসল বিক্রি করতে পেরেছে; তারা কৃতজ্ঞদৃষ্টি তুলে
দিকে তাকাল।

গৃহগামী সাঁওতালেরা আজ আর ছাড়ো ছাড়ো ভাবে পথ চলা পথিক নয়। সকলের মধ্যে একটা অজ্ঞাত সুদৃঢ় সম্পর্ক যেন গড়ে উঠেছে। গোমানী নদীর ধারে এসে পৌঁছতেই, সাঁওতাল জোয়ানদের গলায় গান এসে গেল। গোমানী নদীর জলধারা বালির নীচে লুকিয়ে পড়েছে। শীত-শেষের ফাঁকা মাঠ খাঁ খাঁ করছে, জনতার পায়ে পায়ে পথ থেকে লাল ধুলো উড়ছে। আজ সাঁওতালদের মনে ভরসা, গলায় জোরালো গান, গরুর পিঠে এবং নিজেদের কাঁধে হাট থেকে কেনা নতুন সওদার বোঝা। এ যেন উৎসবের মিছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজ "মাঘ-সিমের" পরব। গতকাল সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হয়েছে। ঘরে ঘরে পচাই ভর্তি হাঁড়ি কলসী। মাঝরাত অবধি বাঁশি ও মাদল বেজেছে এবং জোয়ান ছেলেমেয়েরা নেচেছে গেয়েছে। সিধুদের বাড়ি পার হয়ে দল্‌দলি পাহাড়ের দিকে যে মাঠখানা পড়ে সেখানেই উৎসব হবে। মাঠের পশ্চিমদিকটায় কয়েকটা পুরানো শালগাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে—ছোট্ট একটু বনের মত। সেখানেই তীর খেলার নিশানা স্থির করেছে। গতকাল সারাদিন ধরে জোয়ানেরা মাঠের বেশির ভাগটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

মংরা ভোরবেলা উঠেই তদারক করতে বেরিয়েছে। এখনো বেশ শীত,—মংরার গায়ে একটা মোটা চাদর বেশ অ াঁটসাঁট করে জড়ানো। মংরার কোমরে বাঁশি, গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে সে মাঠের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। গানখানা সে কালই এক দিকু কবির সাহায্যে বেঁধেছে। এইবার সে গলা ছেড়ে গাওয়া শুরু করল :

"ডেউকির চুলে পলাশ ফুল
আগুন হেন জ্বলেরে
আমার বুক জ্বলে যায় রে
বুক জ্বলে যায়……"

গান গাইতে গাইতেই মংরা খুশি হয়ে হেসে উঠল। গত

বছর বসন্তকালে "বাহা" পরবের সময়ে সিধুর মেয়ে সুখিয়াকে সে ভালবেসে ফেলে। সেদিনের কথা স্মরণ করেই সে এ-গান বেঁধেছে। তখনো মংরা ও সুখিয়া নিতান্ত কিশোর কিশোরী। তারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে হেসেছে গেয়েছে নেচেছে। "সোহ্‌রী" পরবের সময়ে মংরার একবার মনে হয়েছিল যে বড়দের মত, সুখিয়াকে ধরে নিয়ে পাহাড়ে চলে যায়। সেদিনও যেন তারা বয়সে ছিল অত্যন্ত কাঁচা, তাই শেষ পর্যন্ত ভরসা পায় নি। গতকাল মংরা বুঝতে পেরেছে এবং সুখিয়াও স্পষ্টভাবে বুঝতে দিয়েছে যে তারা পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ। কাল গান গেয়ে মংরা খুব বাহাতুরি পেয়েছে। কান্‌হু পর্যন্ত তারিফ করেছে। ডেউকিরা অনেকেই কাল তাকে ঘিরে রেখেছিল এবং এখনো পর্যন্ত সে তার গলার পছন দিকে সুখিয়ার গরম নিশ্বাস অনুভব করতে পারছে। আজ তীরের খেলাতেও তাকে বাহাতুরি নিতে হবে। গতবছর বীর সিং, কাওলে, নন্দু আর সে তীর খেলায় সমান সমান গিয়েছিল। এবারে আরো অনেক নতুন জোয়ান আসবে, দু-চার জন ভাল দিকু তীরন্দাজও আসবে। হয়তো সিধু, কানহুও সকলকে উৎসাহ দেবার জন্যে তীর খেলতে পারে।

দেখতে না দেখতেই শতখানেক জোয়ান মংরার পিছনে পিছনে শালবনের ধারে পৌঁছে গেল। তারা একে একে নিশানাগুলো শাল গাছের সঙ্গে আঁটতে আরম্ভ করল,—নিশানার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং বাঘ শুয়োর প্রভৃতি জানোয়ারের নকল।

তখনো প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয় নি। প্রায় আধখানা মাঠ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকে তীর খেলার প্রতিযোগীরা রয়েছে এবং ডান দিকে একটা জায়গায় সিধু ও কানহুকে ঘিরে আরো দশ-বারো জন মোড়ল জটলা করেছ। এরাই প্রতি-যোগিতার বিচারক। সিধুর ইঙ্গিতে মাদল বেজে উঠল এবং জন চারেক মোড়ল জোয়ানদের মধ্যে গিয়ে, কিভাবে তীর খেলা হবে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

শুরুতে একটু সহজ সহজ খেলা,—চল্লিশ হাত দূর থেকে বাঘের মুখ থেকে গলা পর্যন্ত তীর বেঁধানো। তারপর পঞ্চাশ হাত দূর থেকে শুয়োরকে লক্ষ্য করে তেমনি তীর মারা। সব থেকে শক্ত এবং শেষ খেলা হল একশো হাত দূরে হাঁস। মোড়লেরা বাছাই করে একশোজন প্রতিযোগী স্থির করল। প্রথম খেলায় দুটো করে তীর ছুঁড়তে হবে। প্রায় পঞ্চাশজন জোয়ানের দুটো তীরই বাঘের গলায় বিঁধল। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা হল এই পঞ্চাশজনকে নিয়ে,—লক্ষ্য পঞ্চাশ হাত দূরে শুয়োর, বিঁধতে হবে শুয়োরের চোখ ও কান ঘিরে একটা আঁকা চক্র। এবার লক্ষ্য বেঁধা বেশ একটু শক্ত। সমস্ত দর্শক অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, বিশেষত ডেউকিরা প্রত্যেকেই নিজেদের নিজেদের পছন্দসই জোয়ানের সফলতা কামনা করছে। এবারকার পরবের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী সিধুর মেয়ে সুখিয়া। প্রতিযোগীরা অনেকেই তীর ছোঁড়বার আগে তার মুখ স্মরণ করছে।

বীর সিং বরাবরই একটু উদ্ধত প্রকৃতির। সে খোলা-

খুলিই বলে এসেছে যে এবার তীর খেলায় সে-ই প্রথম হবে এবং পছন্দমত ডেউকিকে সাদি করবে। বাঙালী কামারের ছেলে কালু ও বেচুর শক্তসমর্থ চেহারা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব থেকে মনে হয় যে ওরাও ভালই তীর খেলবে। কালু দুবারই বাঘের চোখে তীর বিঁধিয়েছিল। মংরা তখনো মনে মনে গাইছে "বুক জ্বলে যায় রে" আর গলার পিছন দিকে সুখিয়ার তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছে। তার তো প্রথম না হলে চলে না। বীর সিং, কাওলে, নন্দু, কালু, বেচু ও মংরা এদের প্রত্যেকেরই প্রথম তীর এবারও লক্ষ্য বিঁধেছে। তাই এই কজনই আবার একই লক্ষ্যের দিকে দ্বিতীয় তীর ছুঁড়বে। এদের সকলেরই দ্বিতীয় তীরও লক্ষ্য ভেদ করল, তবে কেবল মাত্র কালুর দুটো তীরই এবারও শুয়োরের চোখে বিঁধেছে এবং মংরার দুটো তীরই শূয়োরের কানের ভিতরে একই জায়গায় বিঁধেছে।

এইবার সবচেয়ে শক্ত খেলা, একশো হাত দূরে হাঁসের মুখ থেকে গলা পর্যন্ত লক্ষ্য করে তীর বিঁধতে হবে। প্রতিযোগী মাত্র ছ'জন—বীর সিং, কাওলে, নন্দু, মংরা এবং বাঙালী কামারের ছেলে কালু ও বেচু। দর্শকেরা এখন অত্যন্ত উত্তেজিত। ডেউকিরা নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করে দিয়েছে। মোড়লদের মাথা নেড়ে জটলা চলছে। এই বারের খেলায় একটা করে তীর ছুঁড়তে হবে। বীর সিং-এর তীর হাঁসের ডানা ঘেঁষে গাছে গিয়ে বিঁধল, নন্দুরও তাই। কাওলের তীর হাঁসের ডানায় গিয়ে লাগল। কালুর তীর হাঁসের গলা ঘেঁষে

ঠিক লক্ষ্যের বাইরে এসে বিঁধল। সমস্ত মাঠে চাপা গুঞ্জন, —বাকি শুধু মংরা ও বেচু। বেচুর তীরও হাঁসের ডানায় বিঁধল। এখন বাকি শুধু মংরা, আর মংরার গলার পিছন দিকে সুখিয়ার তপ্ত নিশ্বাস। মংরা লক্ষ্য করছে সমস্ত মন-প্রাণ বেয়ে তার চেতনা নিবদ্ধ হল ঐ চোখে। তীর গিয়ে বিঁধল চোখে। মোড়লরা প্রতিযোগিতার জয় ঘোষণা করবার আগেই কালু এসে মংরাকে কাঁধে তুলে ফেলল এবং তারপর জোয়ানেরা মংরাকে কাঁধে করে নাচ শুরু করল।

সিধুর বাইরের ঘরে মোড়লরা জটলা করছে। বেলা বিকেলের দিকে গড়িয়ে চলেছে ; মাঘ মাস হলেও সূর্যের প্রখর তাপে সকালের শীত এখন একেবারেই চলে গিয়েছে। গ্রামের জোয়ানেরা চারদিকে আনন্দ আহ্লাদ করছে, তাদের কলধ্বনি এখান থেকেও শোনা যায়। মোড়লদের মুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। ওদের মধ্যে কিত্তা, ভাদু এবং সুন্নু মাজি লিখতে পড়তে জানে। কিত্তার বয়স সত্তর পার হয়ে গিয়েছে, মাথার চুল একেবারে সাদা, সেই তখন কথা বলছিল, "আমার তেখুন জোয়ান বয়স ; অনেক দক্ষিণে ময়ুরভঞ্জে হামরার বস্তি। হঠাৎ একদিন পাইক বরকন্দাজ লিয়ে একটা লুক এসে বুল্লে, —এইটো জিমিদারের দখলে, তুদের সোবাইকে মাথাপিছু খাজনা দিতি হোবে। হামরা তো অবাক্। কুথাকার জিমিদার বা ? বস্তি উর দখলে হেটাই বা কি রকম কোথা ? হামরা কুছু বুঝলম নি, জুলুম শুরু হোলো, হামরা বস্তি ছেড়ে

জঙ্গলের মধ্যে গেলম। তারপর পথে পথে, পোরে বহুত হয়রান হয়ে সিধুর বাপের সাথে ইখানে এসে বস্তি বানালম।

তিরলোচন মাঝি বলল, "হামাদের যেখুন শালবনের বস্তি উরা ভাঙিয়ে দিলে তেখুন সাহেব কুম্পানীর লোক বুল্লে—তুরা লিধা উত্তর দিকে যা। সিখানে তুদের জমিন মিলবেক, খাজনা দিতি হোবেক লেই। হামরা ইখানে বস্তি বানালম; পিছলা সালে পাকুড়ের গোমস্তা এসে লুটিশ দিল,—হৈ, তুদের সোব পাকুড়রাজকে খাজনা দিতে হোবেক। সায়েব কুম্পানী ভি ফির খাজনা বিশ গুণ বঢ়িয়ে দিলেক।"

বীর সিং মাজি বলল, "পিছলা সালের বাদলার দিনে হামাদের বস্তিতে খাবার কোম পড়ল, হামরা অনেকে বারহাইতের মহাজনদের কাছে কর্জা করলম তারপর মহাজনরা বুলছে গাঁয়ের আধা জমিন উয়াদের। ইবার গাঁয়ের আদ্ধেক মুনিষকে উয়াদের জমিনে জন খাটতি হোবেক।"

স্থন্নু মাজি বেশ প্রবীণ লোক, লেখাপড়া জানে, বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। সকলেই তাকে খাতির করে। স্থন্নু এখন বলল, "দেখ্, আদ্ধেক বস্তিতে হামরার সোমাজ লেই। পিছলা সালে বহুত জমিন মহাজন আওর জিমিদার খাশ করে লিয়েছে, রেল-জরিপের সায়েবরা হামাদের ডেউকি চুরি কোরে লাপাত্তা করিছে, ইবার কুম্পানীর খাজনা বঢ়লো,—রূপেয়ায় খাজনা দিতে হোবেক, মহাজনদের তাকৎ বঢ়বে, সব জমিন উয়াদের দখলে যাবেক।"

আজকের সভায় জমায়েত মোড়লদের অভিজ্ঞতা বড় কম

নয়। বালক বয়স থেকে এরা বারবার ঘা খেয়েছে, বারবার ইংরেজ কোম্পানী ও বাঙালী জমিদারদের হামলায় এরা বস্তি ছেড়ে পথে বেরিয়েছে। পথে প্রান্তরে এবং বনে জঙ্গলে, এদের প্রত্যেকেই অতি নিকট প্রিয়জনকে হারিয়েছে। তারপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে এসে তারা ঘর বেঁধেছিল, সেই ঘরও কি আবার ভেঙে পড়বে? সকলের মুখেই আসন্ন বিপদের ছায়া, ঘরের ভিতরের আবহাওয়া একেবারে থমথমে। ঘরের বাইরে সারা গ্রামখানা তখন জোয়ানদের নাচগান ও কলহাস্যে মুখরিত।

কানহু ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করল, "না, ইবার হামরা হার মানব নি। হামরা সকলে জানি যে উদের হামলায় বারে বারে হামরার বস্তি ভাঙ্গেছে, হামরা তাড়া খেয়ে জঙ্গলে গিছি। ইবার হামরা পালাব নি। হামরা লড়ব। হৈ শুন্, মাঠে হামাদের জোয়ানদের হাসিগান। হোই হাসি আওর গান হামরা বন্ধ হতে দিবক লেই। সিধু তুই বল্ কেমনে লড়তি হোবে।"

ঘরের সকলেই কানহুর কথায় সায় দিয়ে সিধুর দিকে তাকাল। সিধু বলতে আরম্ভ করল :

"......কানহু ঠিক বুলেছে, হামাদের লড়তেই হোবে। হামি একটো কথা বেশ সমঝেছি—না লড়লে হার হোবেই। আওর লড়লে জিততে ভি পারি।"

সুন্নু মাজি জিজ্ঞাসা করল, "লড়াই কি দিয়া শুরু করবু?"

সিধু বলল, "দেখ্, উরা পেরথম হামাদের সোমাজ

ভাঙ্গতে চায়। হামরা কিরা কোরবো, সোমাজ ভাঙ্গতে দিবক লেই। যেমুন আগের দিনে হামরা সব পরব করতম, ফির লোতুন কোরে সমস্ত পরব দল বেঁধে করতি হোবে। তীরখেলা, কুস্তি, শিকার, লোতুন কোরে সোব জায়গায় দল বেঁধে করতি হোবে।"

কিত্তা প্রশ্ন করল, "হোইটো কিসের লড়াই ?"

"না না, হেইটোই হামরার লড়াই-এর সোব কথা লয়। ইতে সোমাজটো মজবুত হোবে, ছেলেমেয়েরাও মজবুত হোবে। তারপর হামরা খাজনা দিব সেরেফ মাজি আওর নায়েক মারফৎ। কুম্পানীর লুকদের খুশি হয় উরা নামে নামে জমা করিয়ে লিক, হামরা মোড়লদের হাত দিয়েই এক সাথে খাজনা দিব।"

বীর সিং মাজি বলে উঠল, "বারিষের দিনে ঘরে খাবার না থাকলে কি করতি হোবে ?"

সিধু জবাব দিল, "কর্জা হামরা কোরবোক লেই। হামরা গরমের দিনে জঙ্গলে শিকার কোরে খাব আওর মজুত খাবার বারিষের দিনের লেগে ঘরে মজুত থাকবে।"

কিত্তা বলল, "সিধু, তুর ই মতলবটো আদ্ধেক গাঁয়ে খাটবে, কিন্তুক যিসব বস্তিতে সোমাজ কমজোর, লুকে সেখানে মহাজনদের কাছে কর্জা লিবেই।"

বীরসিং বলল, "কর্জা লিয়ে কাম কি, চল হামরা রাতে মহাজনদের বাড়ি লুট করি। গরীবদের মধ্যে ধান বিলি করব।"

সিধু বীরসিং-এর কথায় উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, "বীর সিং তু খবরদার ডাকাতির বাত বুলবি না। হামাদের সব্বোনাশ হোবে।"

তিরলোচন বলল, "ডাকাতি করলে সায়েব কুম্পানী জুলুম করার জুত পাবে, আওর হামাদের সোমাজের সব লুক ভি হামাদের ভাল নজরে দেখবে নি। ডাকাতি কুনো বাত লয়।"

সুন্নু আবার জিজ্ঞাসা করল, "ডাকাতি কুনো বাত লয়, কিন্তুক লড়াইয়ের কি হোবেক? মেদিনীপুরে, ময়ূরভঞ্জে, রামগড়ে হামরা আগেও লড়েছি, তারপর জঙ্গলে ঘুরেছি।"

সিধু বলল, "একটো বাত কি তুই খেয়াল করেছিস, মোড়ল? ইংরেজ কুম্পানী আওর জিমিদার হামাদের উচ্ছেদ কোরেছে আর দিকু কিসানদের ভি উচ্ছেদ কোরেছে। কিন্তুক হামরা মিল্লত কোরি নাই। গরীব দিকু আওর হামাদের এক জোট চাই।"

জটলা অনেকক্ষণ ধরে চলল এবং ক্রমে ক্রমে সকলেরই মত প্রায় একরকম হয়ে উঠল। সুন্নু সায়েবদের জন্য লেখা জবাব সেখানেই মকৃসো করে ফেলল। কেবল বীর সিংএর মনে ডাকাতি সম্বন্ধে খটকা থেকেই গেল, এই নিয়ে সে কানহুর সংগে ফিসফিস করে কথা বলতে থাকল।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। পড়ন্ত রোদ্দুরে মহুয়া গাছের ছায়াটা রাস্তার ওপর অনেকদূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছে। জোয়ানেরা মাদল বাজাতে বাজাতে সিধুর ঘরের সামনে এসে পড়ল। নেতা হিসেবে নির্বাচিত সিধুর ঘর জোয়ানেরা নতুন খড়

দিয়ে ছেয়ে দিয়েছে, এখন তাকে কাঁধে করে নদীর ধারে মাঠের মধ্যে তারা নিয়ে যাবে। জোয়ানদের সমবেত কণ্ঠে উল্লাস ফেটে পড়ল এবং সিধুকে কাঁধে করে তারা চলল নদীর ধারে নাচগানের আসরে।

নদীর ধারে শালগাছের তলায় শতশত সাঁওতাল জোয়ানের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নাচ শুরু হল। ডেউকিরা সব নানান রঙের ফুলে নিজেদের সজ্জিত করেছে। জোয়ানেরা পচাই-এর অবারিত সরবরাহ পেয়ে অত্যন্ত খুশি। প্রান্তর বন এবং নদী ছাড়িয়ে সাঁওতাল জোয়ানদের আনন্দমুখর কলরোল দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। অতি সাবধানী সুন্নু মোড়লেরও মনে হল যে এই সঙ্ঘবদ্ধ আনন্দের সম্বল নিয়ে নিশ্চয়ই লড়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৫৩ সাল। হাওড়া থেকে দিল্লী পর্যন্ত পাকা সড়ক গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। রানীগঞ্জ ও আসানসোলের পাশ দিয়ে সাঁওতাল এলাকার বুক চিরে এই রাস্তা। এই রাস্তার কাছাকাছি এবং অনেক জায়গায় পাশাপাশি নতুন রেললাইন তৈরি হয়েছে; হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত গাড়ি চলাচল ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের লাইনও পাতা হয়েছে ও এগিয়ে চলেছে। রানীগঞ্জ এলাকায় বেঙ্গল কোল কোম্পানী খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু করবার পর আরো অনেকগুলি কোম্পানী খনির কাজ শুরু করে দিয়েছে। জমি থেকে উচ্ছেদ হবার পর সাঁওতালরা এবং বাঙালী ও বিহারী কৃষক এই সব খনিতে মজুরী করছে।

সাঁওতাল এলাকা থেকে অনেক দূরে কলকাতা শহরে কয়েকটি সায়েবী কোম্পানী আজ ছোটলাট হ্যালিডেকে পার্টি দিচ্ছে। তখনো বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন হয়নি। দেশী কুলি বাইরে গলদঘর্ম হয়ে টানা-পাখা টেনে হাওয়া জোগায়।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সমাপ্তিকে উপলক্ষ করেই আজকের এই ভোজসভা। যদিও এখনো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব, তবুও তাদের একচেটিয়া ব্যবসার অবসান হয়ে গেছে। ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের পর থেকেই সায়েব

কোম্পানীদের সকলেরই এদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ হয়েছে।

আজকের ভোজসভায় আটটা রেলকোম্পানীর ও অনেকগুলো জাহাজকোম্পানীর প্রতিনিধি, কয়লাখনির কয়েকজন মালিক এবং ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, চা-বাগান প্রভৃতি হঁকমারী কোম্পানীর প্রতিনিধিরা হাজির। খুব সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছোটলাট ছাড়াও দেখা যাচ্ছে দুতিন জন বড় সায়েব ইঞ্জিনীয়ার এবং জনকয়েক ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকারী। খসখসের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ টানাপাখার হাওয়ার সঙ্গে সঞ্চালিত হচ্ছে। শুরুতেই ছোটলাট সায়েবের দীর্ঘ জীবন কামনা করে স্বাস্থ্যপান করা হল। ইতিমধ্যেই ভোজসভার কথাবার্তা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কথাবার্তা চলছিল। শোনা গেল যে ছোটলাট একটু হেসে মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী ডাঃ স্মিথকে বিদ্রূপের সুরে বলছেন, "তাহলে স্মিথ, তুমি মনে কর যে এদেশে কয়লার খনির সঙ্গে সঙ্গেই লোহার কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, তামার কারখানা প্রভৃতি শুরু করে দেওয়া দরকার?" স্মিথ বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই জোর দিয়ে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়, লোহা তৈরির এমন সরেশ কাঁচা মাল পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে। কেওঞ্চর, ময়ূরভঞ্জ এবং সিংভূমে দেখলাম যে সারিসারি পাহাড় প্রমাণ লোহার কাঁচামাল। ঘাটশীলার কাছে দেখলাম তামা তৈরির উৎকৃষ্ট কাঁচামাল। রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো

সিধু বীরসিং-এর কথায় উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল "বীর সিং তু খবরদার ডাকাতির বাত বুলবি না। হামাদের সব্বোনাশ হোবে।"

তিরলোচন বলল, "ডাকাতি করলে সায়েব কুম্পানী জুলুম করার জুত পাবে, আওর হামাদের সোমাজের সব লুক তি হামাদের ভাল নজরে দেখবে নি। ডাকাতি কুনো বাত লয়।"

সুন্নু আবার জিজ্ঞাসা করল, "ডাকাতি কুনো বাত লয়, কিন্তুক লড়াইয়ের কি হোবেক? মেদিনীপুরে, ময়ুরভঞ্জে, রামগড়ে হামরা আগেও লড়েছি, তারপর জঙ্গলে ঘুরেছি।"

সিধু বলল, "একটো বাত কি তুই খেয়াল করেছিস, মোড়ল? ইংরেজ কুম্পানী আওর জিমিদার হামাদের উচ্ছেদ কোরেছে আর দিকু কিসানদের ভি উচ্ছেদ কোরেছে। কিন্তুক হামরা মিল্লত কোরি নাই। গরীব দিকু আওর হামাদের এক জোট চাই।"

জটলা অনেকক্ষণ ধরে চলল এবং ক্রমে ক্রমে সকলেরই মত প্রায় একরকম হয়ে উঠল। সুন্নু সায়েবদের জন্য লেখা জবাব সেখানেই মক্‌সো করে ফেলল। কেবল বীর সিংএর মনে ডাকাতি সম্বন্ধে খটকা থেকেই গেল, এই নিয়ে সে কানহুর সংগে ফিসফিস করে কথা বলতে থাকল।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। পড়ন্ত রোদ্দুরে মহুয়া গাছের ছায়াটা রাস্তার ওপর অনেকদূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছে। জোয়ানেরা মাদল বাজাতে বাজাতে সিধুর ঘরের সামনে এসে পড়ল। নেতা হিসেবে নির্বাচিত সিধুর ঘর জোয়ানেরা নতুন খড়

দিয়ে ছেয়ে দিয়েছে, এখন তাকে কাঁধে করে নদীর ধারে মাঠের মধ্যে তারা নিয়ে যাবে। জোয়ানদের সমবেত কণ্ঠে উল্লাস ফেটে পড়ল এবং সিধুকে কাঁধে করে তারা চলল নদীর ধারে নাচগানের আসরে।

নদীর ধারে শালগাছের তলায় শতশত সাঁওতাল জোয়ানের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নাচ শুরু হল। ডেউকিরা সব নানান রঙের ফুলে নিজেদের সজ্জিত করেছে। জোয়ানেরা পচাই-এর অবারিত সরবরাহ পেয়ে অত্যন্ত খুশি। প্রান্তর বন এবং নদী ছাড়িয়ে সাঁওতাল জোয়ানদের আনন্দমুখর কলরোল দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। অতি সাবধানী সুন্নু মোড়লেরও মনে হল যে এই সঙ্ঘবদ্ধ আনন্দের সম্বল নিয়ে নিশ্চয়ই লড়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৫৩ সাল। হাওড়া থেকে দিল্লী পর্যন্ত পাকা সড়ক গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। রানীগঞ্জ ও আসান-সোলের পাশ দিয়ে সাঁওতাল এলাকার বুক চিরে এই রাস্তা। এই রাস্তার কাছাকাছি এবং অনেক জায়গায় পাশাপাশি নতুন রেললাইন তৈরি হয়েছে; হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত গাড়ি চলাচল ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের লাইনও পাতা হয়েছে ও এগিয়ে চলেছে। রানীগঞ্জ এলাকায় বেঙ্গল কোল কোম্পানী খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু করবার পর আরো অনেকগুলি কোম্পানী খনির কাজ শুরু করে দিয়েছে। জমি থেকে উচ্ছেদ হবার পর সাঁওতালরা এবং বাঙালী ও বিহারী কৃষক এই সব খনিতে মজুরী করছে।

সাঁওতাল এলাকা থেকে অনেক দূরে কলকাতা শহরে কয়েকটি সায়েবী কোম্পানী আজ ছোটলাট হ্যালিডেকে পার্টি দিচ্ছে। তখনো বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন হয়নি। দেশী কুলি বাইরে গলদঘর্ম হয়ে টানা-পাখা টেনে হাওয়া জোগায়।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সমাপ্তিকে উপলক্ষ করেই আজকের এই ভোজসভা। যদিও এখনো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব, তবুও তাদের একচেটিয়া ব্যবসার অবসান হয়ে গেছে। ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের পর থেকেই সায়েব

কোম্পানীদের সকলেরই এদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ হয়েছে।

আজকের ভোজসভায় আটটা রেলকোম্পানীর ও অনেকগুলো জাহাজকোম্পানীর প্রতিনিধি, কয়লাখনির কয়েকজন মালিক এবং ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, চা-বাগান প্রভৃতি রকমারী কোম্পানীর প্রতিনিধিরা হাজির। খুব সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছোটলাট ছাড়াও দেখা যাচ্ছে দুতিন জন বড় সায়েব ইঞ্জিনীয়ার এবং জনকয়েক ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকারী। খসখসের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ টানাপাখার হাওয়ার সঙ্গে সঞ্চালিত হচ্ছে। শুরুতেই ছোটলাট সায়েবের দীর্ঘ জীবন কামনা করে স্বাস্থ্যপান করা হল। ইতিমধ্যেই ভোজসভার কথাবার্তা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কথাবার্তা চলছিল। শোনা গেল যে ছোটলাট একটু হেসে মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী ডাঃ স্মিথকে বিদ্রূপের সুরে বলছেন, "তাহলে স্মিথ, তুমি মনে কর যে এদেশে কয়লার খনির সঙ্গে সঙ্গেই লোহার কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, তামার কারখানা প্রভৃতি শুরু করে দেওয়া দরকার?" স্মিথ বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই জোর দিয়ে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়, লোহা তৈরির এমন সরেশ কাঁচা মাল পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে। কেওঞ্ঝর, ময়ূরভঞ্জ এবং সিংভূমে দেখলাম যে সারিসারি পাহাড় প্রমাণ লোহার কাঁচামাল। ঘাটশীলার কাছে দেখলাম তামা তৈরির উৎকৃষ্ট কাঁচামাল। রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো

এবং হাজারিবাগ জেলা জুড়ে কয়লার খনি ছড়িয়ে রয়েছে। আর সস্তা কুলিরও অভাব নেই। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরিতে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারে এমন সাঁওতাল এবং বিহারী কুলি হাতের কাছেই রয়েছে।”

স্মিথের এই উৎসাহপূর্ণ কথাবার্তায় ভোজসভার আলাদা আলাদা টুকরো কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই আগ্রহ-ভরে ছোটলাট এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক স্মিথের কথাবার্তা শুনতে থাকল, কেউ কেউ তাতে যোগ দেবারও চেষ্টা করল। ছোটলাট হ্যালিডে সায়েব হাত নেড়ে স্মিথকে থামিয়ে বললেন, “স্মিথ, তুমি শুধু বৈজ্ঞানিক, মোটেই ব্যবসায়ী নও। তুমি কি বোঝোনা যে এদেশকে করে তুলতে হবে আমাদের দেশের তৈরি লোহার বাজার আর তুমি চাইছ যে এদেশ হবে আমাদের লোহার ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী।”

ছোটলাটকে সমর্থন করে সবচেয়ে বড় রেলকোম্পানীর প্রতিনিধি গর্ডনসাহেব বলে উঠলেন, “মূল ইউরোপে আমাদের ব্যবসার বাজারে অনেকদিন থেকেই মন্দা শুরু হয়েছে এবং ১৮৪৭এর আর্থিক মন্দার পর থেকে উপনিবেশের বাজার বাড়িয়ে তোলা ছাড়া ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের বাঁচবার পথ নেই। তাই আমাদের বেশি দরকার এদেশে ভাল রাস্তা এবং রেলপথ তৈরি করা। তাই বড়লাট সায়েব ঘোষণা করেছেন, যে-কোনো বিলিতী রেলকোম্পানী আসুক

না কেন, তার মূলধনের উপর কমপক্ষে শতকরা পাঁচটাকা লাভের গ্যারান্টি আমরা দিচ্ছি, কারণ রেলপথ ছাড়া আমাদের উপায় নেই।"

ছোটলাট হ্যালিডে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, "সাবাস গর্ডন, তুমি বেশ জুত করে কথাটা বলেছ। তবে রেল ছাড়াও কয়লার খনি চলতে পারে এবং এ দেশের কাঁচা মালকে চালানির উপযুক্ত করবার জন্য নিচুস্তরের কারখানা করতে দেওয়া চলতে পারে।"

ছোটলাটের কথার তারিফ করে ভোজসভার সকলেই হাততালি দিয়ে উঠল। কেবল ডাঃ স্মিথ একটু ম্লান হেসে বললেন, "আমি ব্যাপারী নই, বৈজ্ঞানিক। কিন্তু একথা আমি বেশ বুঝতে পারছি যে এদেশে লোহা এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠতে বাধ্য। একজন বড় জার্মান পণ্ডিত আমেরিকার কাগজে ঠিক একথাই লিখেছে।" ছোটলাট স্মিথকে থামিয়ে বললেন, "আজকের সভায় তোমরা আমাকে প্রধান অতিথি করেছ, এবং শুরুতেই আমার স্বাস্থ্যপান করেছ, তার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু আজকের দিনে আমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ওই একজন ইঞ্জিনীয়ারের, ওই যে ওই ধুরন্ধর চীফ ইঞ্জিনীয়ার, যিনি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মত এত বড় একটা রাস্তা তৈরি করলেন এবং এই রেলপথ, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের ইঞ্জিনীয়াররা, যাঁরা চারদিকে রেলপথ ও টেলিগ্রাফের লাইন ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আসুন আমরা এই ইঞ্জিনীয়ারদের স্বাস্থ্যপান করি।"

গেলাসে গেলাসে বিলিতী মদ ঢালা হল এবং একনিশ্বাসে পানক্রিয়াও সমাপ্ত হল।

এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দক্ষিণ দিকের জানলাগুলো খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আরামদায়ক ঝিরঝিরে বাতাস আসতে আরম্ভ করল। এইবার ভোজ আরম্ভ হবে। টেবিলের উপরে আয়োজনের প্রাচুর্য চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। ভোজের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত পানও চলতে থাকল। এইবার কথাবার্তার নতুন করে প্রেরণা জোগালেন "কলিকাতা রিভিউ," "ভারতবন্ধু" প্রভৃতি খবরের কাগজের হোমরাচোমরারা। উড্‌হেড সায়েব বেশ একটু প্রমত্ত অবস্থাতেই দাবি করলেন, "দেশী খবরের কাগজের কণ্ঠরোধের রীতিমত ব্যবস্থা হওয়া উচিত,—ওরা মরিসাস এবং অন্যান্য দ্বীপে সাঁওতাল, বাঙালী ও বিহারী কুলি চালান দেবার নিন্দে করছে। তারপর নানান খুঁটিনাটি নিয়ে প্রায়ই ফ্যাকড়া তুলছে।" উড্‌হেডের পরেই মিঃ ফক্স বলে উঠলেন, "আজ সকালের দেশী কাগজে আবার রেল বিস্তারের খরচ কমিয়ে শিক্ষা বিস্তারের দাবি করা হয়েছে।"

সভায় বেশ একটা হাসির রোল উঠল। উড্‌হেড সায়েব আবার বললেন, "উপস্থিত মহিলারা আমাকে মার্জনা করবেন। আমি আর একটা কথা না বলে পারছি না। কাগজে আবার সায়েব কর্তৃক দেশী নারী ধর্ষণের খবরও বেরোচ্ছে। কোথাকার কে নীলকর সায়েব নাকি বাঙালী মেয়ে চুরি করেছে, আর রেলওয়ের সায়েব সাঁওতাল মেয়ে

চুরি করে গুম করেছে। দেশী খবরের কাগজের এই বিষাক্ত প্রচারের টুঁটি চেপে ধরা দরকার।”

ভোজসভার অনেকেই সমর্থনসূচক আওয়াজ করলেন।

ছোটলাট হ্যালিডে সায়েব শেষ বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন :

“আমি এই সভায় তিনজন চিরস্মরণীয় স্বদেশবাসীর স্বাস্থ্যপান করার প্রস্তাব করি। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন লর্ড ক্লাইভ যিনি জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি ভারতীয় ধনীদের সহযোগিতা লাভ করে এদেশে বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা করলেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন লর্ড কর্নওয়ালিস যিনি জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করে এদেশী জমিদারদের সাহায্যে বৃটিশ শাসন স্থায়ী করলেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের বড়লাট ডালহৌসী, যিনি ভারতের সমস্ত সামন্ত শাসকদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছেন এবং রেলপথ বসিয়ে ও পাকা সড়ক তৈরি করে বৃটিশ শাসনকে অপরাজেয় করে তুলেছেন। আসুন, আমরা সকলে এই তিনজন মহান ইংরেজের স্বাস্থ্যপান করি।”

ভোজসভায় গেলাস ঠোকাঠুকির আওয়াজের সঙ্গে প্রচণ্ড উদ্দীপনার কলধ্বনি ফেটে পড়ল। অতঃপর ভোজসভা থেকে দুয়ে-দুয়ে চারে-চারে নিমন্ত্রিতরা নাচঘরের দিকে এবং খোলা বারান্দার দিকে চলতে থাকলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাঁওতাল অঞ্চলে এবার গ্রীষ্মকাল এসেছে একেবারে রুদ্ররূপে। বোশেখের মাঝামাঝি মাঠ ফেটে চৌচির হয়েছে, গোমানী নদীর কোথাও আর ক্ষীণ জলধারাও লক্ষ্য করা যায় না, খুব গভীরভাবে বালি খুঁড়লে তবে জলের সন্ধান মেলে। ভাগনাদিহির অগভীর পুকুরগুলো এবং প্রায় সবগুলো কুয়োই এখন শুকিয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা অনেকেই ভোরের দিকে বারহাইতে চলে গিয়ে পন্টেট সায়েবের পুকুর থেকে জল আনে। সন্ধ্যার দিকে সাঁওতাল মেয়েরা গোমানী নদীর বালি খুড়ে অনেক কষ্টে কলসী ভর্তি করে। ভোর হতে না হতেই ছোট্ট ছেলেরা কোমরে কিছু শুকনো মকাই বেঁধে গরু-মোষ-ছাগল নিয়ে বেরিয়ে যায় দল্‌দলি পাহাড়ের দিকে; দল্‌দলি পাহাড়ের আড়ালে এখনো কিছু সবুজ ঘাস-পাতা আছে এবং একদিকে বিস্তীর্ণ জলার মধ্যে গরু-বাছুরের খাওয়ার মত জল পাওয়া যায়।

বোশেখ মাসের দুপুরবেলা। সমস্ত আকাশটা একখানা জ্বলন্ত সীসার পাতের মত শুধু তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কোথাও মেঘের লেশমাত্র নজরে আসেনা। লু বইছে, গায়ে লাগলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগার মতই মনে হয়। ঘরের বাইরে জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই, বাইরে থেকে লক্ষ্য করলে গ্রামের মধ্যেও লোকজনের কোনও চলাচল লক্ষ্য করা যায় না। আজ কিন্তু ভাগনাদিহির ঘরে ঘরে আয়োজনের সরগরম।

আজ সন্ধ্যার পর এই অঞ্চলের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে শিকারের বৈঠক বসবে এবং কাল সকালে সকলে দল বেঁধে শিকারের জন্য বনে যাত্রা করবে। সাঁওতালদের এই শিকারের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; অপরাধীর সাজা দেওয়া, জমির অধিকারে রদবদল করা, নায়েক-মাজি-পরগণাইত প্রভৃতি মুরুব্বি নিয়োগ ও খারিজ করার দায়িত্ব এই বৈঠকের উপরেই ন্যস্ত। দরকার হলে এই শিকারের বৈঠক সমাজদ্রোহী সাঁওতালকে গ্রাম থেকে বের করে দিতে পর্যন্ত পারে।

সিধুর বাড়িতে আজ অতিথি হয়েছে সাঁওতালদের দুজন বুড়ো মোড়ল সুন্নু আর কিত্তা। এইমাত্র তাদের খাইয়ে সিধু বাইরের ঘরে রেখে এল, সেখানে সিধুর ভাই কানহু তাদের সাথে আলাপ করছে। এখন সিধু ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসল। সিধুর পাতে ভাত ঢালতে ঢালতে বৌ লখিয়া বেশ একটু নালিশের সুরেই বলে উঠল, "গোটা সাল তো তুই বাইরে বাইরেই ঘুরে কাটালি, এখুন খাবার সময়ে ভাবনা কেনে?" সিধু এতক্ষণ একটু অন্যমনস্ক ছিল, এখন সে পরম স্নেহভরে ছেলেমেয়েদের খাওয়ার দিকে তাকাল, কাওলে ও সুখিয়া তখন বড় বড় দলা করে খেয়ে চলেছে। তাদের দিকে একান্তভাবে তাকিয়ে সিধু বলল, "এই সাল সেরেফ ভাবনা লিয়েই আছি। ছাওয়ালদের দেখি আওর ভাবনা হয়, কেতদিন উদের হাসিগান টিঁকবে! চারোওর ঝামেলা, তাই ভাবি।"

লখিয়া বলল, "হামরা তো এই সাল বহুৎ কুছু কন্নু, ঘরে

ঘরে বহু ও ডেউকি তসরের সুতো কাটনু, ঘরে ঘরে তাঁত ভি চোলছে, হামরার ভাগনাদিহির কেউ মহাজনের কাছে হাত পাতেনি। সোব ঠিক হোবে। তুই ভাবিস কেনে?"

সিধু হোহো করে হেসে বলল, "এখনো কুচ্ছু হোয়নি রে, কুচ্ছু হোয়নি। কাম বহুৎ কোরতে হোবে। তুসমন কি সেরেফ মহাজন? সায়েবলোগ বড় ধড়ীবাজ, উদের রাজত্ব উদের বহুৎ খ্যামতা, হামি চারোওর ঘুরিয়ে বেড়াই, লজর রাখি, কিন্তুক লিজেও জানি না উদের ঠিক কেত খ্যামতা।"

লখিয়া তার জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, ছোটবেলায় বহুদূর দেশে স্বগ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে পথে পথে ও বনে জঙ্গলে বহুকাল তাকেও ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, সহজে বিচলিত হবার মত মেয়ে সে নয়। তবু সিধুর ভাবগতিক দেখে গত একবছর সে প্রায়ই ঘাবড়ে যায় এবং আনমনা হয়ে ওঠে। অনেক কষ্টে তৈরি ঘরগুলোর দিকে সে বার বার তাকায়, অনেক যত্নে লালিত আম কাঁঠালের বাগানের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে আবার নতুন করে উচ্ছেদের আশঙ্কায় তার চোখে জল আসে, পরম নির্ভরশীল গরু-মোষগুলোর ডাগর ডাগর চোখের দিকে তাকিয়ে লখিয়ার ডাগর চোখও দুর্ভাবনায় কাঁপতে থাকে। সিধুর অনুপস্থিতিতে গভীর রাতে হঠাৎ জেগে উঠে পাশে সিধুকে না দেখে সে আতঙ্কিত হয়, বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে আসে, আবার শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করে। সাঁওতাল সমাজের মধ্যে সকলের বড় মোড়ল সিধুর গুরুভার দায়িত্বের

কথা লখিয়া বেশ বোঝে, সে বেশ বোঝে যে তাদের জীবনে একটা মস্ত বড় বিভ্রাট আসছে এবং সিধু ও অন্যান্য সাঁওতাল মোড়লেরা তার জন্য তৈরি হচ্ছে। আজকে সিধুকে ভাল করে খাওয়াবে বলে সে কাঁচা আম পুড়িয়ে এনেছে। সিধু এবং ছেলেমেয়েদের পাতে পোড়ানো খোসা ছাড়ানো আম দেবার সময়ে তার ডান চোখ ঘনঘন কাঁপতে লাগল। সিধু বড় বড় দলা করে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল, লখিয়ার পিঠের উপর বাঁহাত রেখে দাঁড়িয়ে সে কাওলেকে জিজ্ঞাসা করল, "হেই কাওলে, মংরা আওর উর দোস্ত ফিরছে?" কাওলে জানাল যে তারাও ফিরে বাইরের ঘরে বসে আছে।

সিধু যখন বাইরের ঘরে পৌঁছল তখনও বাইরে অসহ্য গরম, কিন্তু ঘরের মধ্যে আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। সিধু ঘরে ঢুকতে কথাবার্তা একটু থমকে গিয়েছিল, তখন আবার মংরা তার বন্ধু কালুর সঙ্গে মুঙ্গের ও পাটনা ঘুরে আসার বিষয়ে গল্প করছিল, "জানিস মোড়ল, মুঙ্গের দেখে হামি অবাক হইছি। বাংলার নবাবের কেল্লা এখন ইংরেজ লোগের দখলে আর সি কেল্লা থিকে কামানের লড়াই হইত। কেত কামান দেখলম! কালুর সাথে লোহারদের বস্তিতে ভি গিয়েছিলম। কালুর বুঢ়া দাদা এখুনো লুকিয়ে বন্দুক তেয়ার কোরে। হামরা জঙ্গলে বন্দুক দিয়া শিকার করলম। তুর কথামত পাটনাতে ভি গেলম, হামাদের গাঁয়ের রহমৎ জোলা ওয়াহাবীদের সাথে আলাপ করিয়ে দিলেক..."

সিধু মংরাকে থামিয়ে বলল, "তুদের সাথে ইসোব লিয়ে রাত্তিরে কথা হোবেক। এখুন মোড়লদের সাথে বহুৎ আলাপ আছে, তুরাও থাক।"

খুব গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা আরম্ভ করবার আগে অনেক সময়ে একটা থমথমে ভাব দেখা যায়। সিধু আসার পর নতুন করে আলোচনা শুরু করবার আগে সকলেই গম্ভীর হয়ে উঠল। সিধু ও তার ভাই কানহু, সাঁওতাল এলাকার বুড়ো মোড়ল সুন্নু ও কিত্তা এবং সাঁওতাল ও দিকু (বাঙালী) জোয়ানদের নেতা মংরা ও কালু সকলেই গম্ভীর। মোড়লেরা তাদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে এক বছরের কাজের হিসেব দিতে থাকল। এই এক বছরে তারা দামিন-ই-কো ছাড়াও আশপাশের জেলাগুলোর সাঁওতাল অঞ্চল এবং সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্যান্য আদিবাসীদের এলাকাগুলো ভাল করে পরখ করে দেখেছে। এই এক বছরে সাঁওতাল এলাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। যেসব গ্রাম মহাজনদের কাছে হাত পাতবে না বলে দৃঢ়ভাবে থেকেছে সেখানকার চেহারা এক রকম আর যেখানে মহাজনরা সাঁওতালদের মধ্যে আসর জমাতে পেরেছে সেখানকার চেহারা একেবারে অন্যরকম। মহাজনদের প্রভাবিত গ্রামে সাঁওতাল সমাজ প্রায় ভেঙে পড়েছে। সাঁওতালদের দখল থেকে বেশির ভাগ জমি বেরিয়ে গিয়েছে আর অনেক জোয়ান ছেলেমেয়ে আড়কাঠিদের কবলে পড়ে অজানা দেশে কাজের সন্ধানে গিয়েছে,

আবার অনেকে রানীগঞ্জের কয়লার খাদে কিংবা আশপাশের রেলপথে মজুরী করতে গিয়েছে। এই ধরনের ভাঙা গ্রামের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু মোড়ল হিসেব করে দেখাল যে তিনভাগের একভাগ সাঁওতাল-গ্রামে সমাজের শাসন ভেঙে পড়েছে। বাকি গ্রামের মধ্যে বেশীরভাগই সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। রেশমের সুতো এবং লা' সংগ্রহের কাজ করে এইসব গ্রামের সাঁওতাল-দের আয় একটু বেড়েছে। মহাজনদের মারফৎ কাপড় না কিনে কতকটা ঘরে কাপড় বুনে এবং বাকিটা তাঁতিদের কাছ থেকে সরাসরি কেনার দরুণ সাঁওতাল এবং তাঁতিরা উভয়েই লাভবান হয়েছে এবং তাদের পরস্পর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছে। বেশি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গাঁয়ের ও গঞ্জের লোহার ও কামারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সাঁওতালরা এখন সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে নিজেদের পুরানো পরবগুলো শুরু করায় এখন শুধু লাঙ্গলের ফাল, কাটারি, কাস্তে, কুড়ুল, কোদালই নয় বর্শা এবং তীরের ফলা তৈরিরও ধুম পড়ে গিয়েছে। সাঁওতাল-দের সঙ্গে বাঙালী কামারদের সম্পর্ক এখনো খুব ঘনিষ্ঠ, বিশেষত বাঙালী জোয়ান কালুর নেতৃত্বে আশপাশের সমস্ত গ্রামের কামার জোয়ানেরা সাঁওতালদের পরবে নিয়মিত যোগ দেওয়ার ফলে, এখন সাঁওতাল ও বাঙালী জোয়ানদের মধ্যে বন্ধু সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আরেকটা ছবি যা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল সেটা হচ্ছে অবনতির ও সমাজদ্রোহিতার। সাঁওতালের ঘর থেকে

মরদদের সামনেই যুবতী সাঁওতাল মেয়েদের নীলকর ও রেলপথের সায়েবরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে,—ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজে মরদেরা সায়েবদের তাড়া না করে ঘরে পালিয়ে এসেছে। সমাজদ্রোহী হয়ে সাঁওতাল জোয়ানদের ভুল বুঝিয়ে দুতিন জন মোড়ল তাদেরকে আড়কাঠিদের হাতে সঁপে দিয়েছে। কিছু সাঁওতাল বেনেগড়ির সাহেব মিশনারীদের কবলে পড়ে সাঁওতাল সমাজের বিরুদ্ধে রীতিমত গোয়েন্দাগিরিও আরম্ভ করে দিয়েছে। প্রবীণ মোড়লদের আলোচনার ধীর স্থির কথাবার্তার মধ্যে রাগের গর্জন শোনা যেতে লাগল। কানহু হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, “আজ রাতে শিকারের জুমায়েতে হেই বেইমানদের সাজার রায় চাই। উদের সাজা না দিলি সব্বোনাশ হোবে।” কিত্তা, সুন্নু ও সিধু সকলেই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে কানহুর সঙ্গে একমত হল। ঠিক হল যে শিকারের বৈঠকে কানহুই সমাজদ্রোহীদের সাজার কথা তুলবে, সুন্নু ও কিত্তা কানহুকে সমর্থন করার এবং জমায়েতের সকলে পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করবার পরে সিধু ওদের সাজার কথা প্রস্তাব করবে।

সিধুদের বাড়িতে মোড়লদের ঘরোয়া বৈঠকের পরে সেই রাতে শিকারের জমায়েত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি, কারণ তখনো বিভিন্ন এলাকার পূর্ণবয়স্কেরা অনেকেই হাজির হতে পারেনি। পরের দিন সকালে তারা সমবেত হয়ে বনের মধ্যে যাত্রা করে। আজ শিকারের দ্বিতীয় দিন। এই এলাকায়

শালগাছ ছাড়াও যথেষ্ট সংখ্যায় পলাশ, মহুয়া, আম, জাম এবং কাঁঠাল গাছ আছে, তা ছাড়া মাঝে মাঝে বাবলা এবং অন্যান্য কাঁটাওলা ছোটখাটো গাছের ভিড় দেখা যায়। মাটি অনেক জায়গাতেই অসমতল, মাঝে মাঝেই ছোটখাটো পাহাড়, কখনো ন্যাড়া এবং কখনো গাছপালায় ভর্তি। ছোটখাটো পাহাড়ে নদী বালিতে ভর্তি। আজ শিকারীরা যেখানে সন্ধ্যার দিকে জমা হয়েছে সেখানে নদীর একটা অংশে কতকটা পুকুরের মত বদ্ধ জল জমা হয়ে আছে। এই জলই তারা খাবার জন্য ব্যবহার করছে। সমস্ত দিন ধরে বেশি পরিমাণে জোগাড় করতে পেরেছে ফলমূল। মাত্র কয়েকটা বুনো শুয়োর তারা শিকার করতে পেরেছে।

জলের কাছে শুকনো নদীর বালির উপরে এবং নদীর পাড়ে শিকারীরা সন্ধ্যার দিকে সকলে সমবেত হল। খুব বেশি লক্ষ্য না করলেও নজরে পড়ে যে শিকারীরা একটা খাপছাড়া জমায়েত নয়, গ্রাম ও এলাকা হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন মোড়লকে কেন্দ্র করে তারা চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। গত দুবছর ধরে নিয়মিত উৎসব এবং শিকারের মহড়ার ফলে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাব আগের চেয়ে অনেক বেশি।

জলের ধারেতেই চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে সিমূলচাপ এলাকার সাঁওতাল জোয়ানেরা গোল হয়ে নাচছে। মাদল থেকে বোল উঠছে,—ধিতাং ধিতাং লো ধিতাং। মাদলের বোলের সঙ্গে সাঁওতাল জোয়ানদের সুদৃঢ় দেহগুলো দুলছে-নাচছে, পিঠে বাঁধা লম্বা লম্বা ধনুক বা কাঁড়, অনেকের হাতে

লম্বা বর্শা। দিনের অসহ্য গরম অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে, সন্ধ্যার হাওয়ায় আন্দোলিত শালগাছের পাতাগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে, জোয়ানদের নাচের সঙ্গে সঙ্গে মাদলের একটানা বাজনা ছাড়াও মাঝে মাঝে হুঙ্কার উঠছে। শিমূলচাপের জোয়ানদের দেখাদেখি অন্য এলাকার জোয়ানেরা নাচগান শুরু করল,—রকমারি নাচ, এইসব নাচের সঙ্গে হাজার হাজার বছরের সঙ্ঘবদ্ধ অরণ্য জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে; কখনো নাচের মধ্যে ফুটে ওঠে সফলকাম শিকারের স্ফূর্তি, কখনো শত্রুর সঙ্গে মৃত্যুপণ লড়াই-এর সংকল্প ও কঠোরতা, জয়োল্লাসের মধ্যে উৎসবের মত্ততা।

জোয়ানেরা নাচছে-গাইছে, মোড়লেরা আজকের সভার বিষয় নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা করছে, সন্ধ্যা হলেও শুক্ল-পক্ষের চাঁদের দৌলতে অন্ধকার হয়নি। হঠাৎ কিছুদূরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সিধুর নির্দেশমত জনকয়েক জোয়ান শীঘ্রই সংবাদ নিয়ে এল যে মাইলখানেক দূরে বারহারোয়ার রেলের সায়েববা ভাড়াটে শিকারী নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে। এই খবর প্রচার হওয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই সমবেত জনতার মধ্যে রূপান্তর দেখা দিল। নাচগান হাসিঠাট্টার পরিবেশের বদলে সকলের মুখে ঘৃণা ও রাগ মেশানো একটা কঠোর ভাবে ফুটে উঠল। এই রেলওয়ে সায়েবরাই গতবছর পুরুষদের অনুপ-স্থিতিতে সাঁওতাল বস্তি থেকে মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে বলে সকলে মনে করে। সেই মেয়েদের কোনও খোঁজখবর পরেও পাওয়া যায় নি, আজ পর্যন্ত তারা লাপাত্তা। বীরসিং

মাজি তার চওড়া বুকে চাপড় মেরে হাঁক দিয়ে সিধুকে বলল, "মোড়ল, তুই সেরেফ হুকুম দে, হামি তীর বিঁধে ঐ সায়েবগুলিনকে খতম করিয়ে দি।" শতশত জোয়ানের কণ্ঠে সমর্থনের হুঙ্কার ফেটে পড়ল। সিধু বলল, "উদের মারা এমন কুছু শক্ত কাম লয়, তবে আজ উদের ধরা শক্ত, উরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলতিছে। এখুন আয়, হামরা সভা করে হামাদের রায় ঠিক করি, হামাদের লিজেদের ঘর সামলাই, ঘরের ত্বশমনদের ব্যবস্থা পয়লা কাম, তেখুন বাইরের ত্বশমনদের শায়েস্তা করা শক্ত হোবেক লেই।" এর পর সে কানহুকে কিছু বলার জন্য ইঙ্গিত করল।

কানহুর বক্তৃতা শুরু হবার পর থেকেই সমগ্র জনতা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে,—হাজার খানেক লোকের নিশ্বাস ফেলারও যেন অবকাশ নেই, কানহুর আবেগদীপ্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে বোশেখ মাসের দমকা হাওয়ায় আন্দোলিত পত্রমর্মর। কানহু তখন বলছে, "ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজে ডরায় আওর ঘরের ঔরতের ইজ্জৎ বাঁচাতে লারে—হেরা মরদ লয়, সাঁওতাল সোমাজের কেউ লয়। উরা হামরার সোমাজের ভিতরির ত্বশমন। হেই ত্বশমনদের বরদাস্ত কোরবোক লেই। আজ ইদের সোমাজ থিকে নিকাল দিতি হোবে। ইটো না কোরলে আরও বেশি মুনিষ না-মরদ হোবে, হামরা ঘর সমহালতে পারবোক লেই। (সমস্ত জনমতের সমর্থন চিৎকার শব্দে ফেটে পড়ল)...... আওর একটো বাত, কেবল মাজি আওর কিনু নায়েক—

হামাদের শিকারের জুমায়েতে উরা এসেনি। পিছলা সালে উরা আড়কাঠির কাম করিয়েছে। তুরা জানিস আড়কাঠিটো কিবা? গরমের দিনে ঘরে যেখুন খাবার লেই, তেখুন উরা বস্তা বস্তা চাউল জোয়ানদের মধ্যে বিলি কোরলেক, আওর বুললেক,—খুব ভাল নোকরি আছে, সেখান থিকে হামরা ঘরে রূপেয়া ভি ভেজতে পারব আওর সিখানে হামরার খাবার ভি কোনো মুস্কিল হোবেক লেই। পরে তুদের কিত্তা মোড়ল বুলবেক হেই জোয়ানেরা এখুন কোথায়। হামি তো জানি উরা লাপাত্তা, হামাদের মুলুকে উরা আওর ফিরবেক লেই। ই মোড়ল দুইটো এখুনো সি মতলবেই আছে। ইদের ভি সাজা চাই। হামরার সোমাজে যদি জান লিবার রেওয়াজ থাকত, হামি কইতম হৈদের জান লিবার চাই। হামরা ঠাণ্ডা মানুষ, কেউরে জানে মারি না, তাই ই দুটোকে সোমাজ থেকে দূর কোরা চাই। আরও একটো বাত হামার আছে,—কুছু সাঁওতাল সায়েব পাদ্রীদের সঙ্গে মিলে হামাদের সোমাজের খিলাপ গোয়েন্দার কাম কোরে। উদের সোমাজের মধ্যে কুনো ঠাঁই লেই।” কানহুর বক্তৃতার সময়ে এবং পরে সমগ্র জনতা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল, কানহুর সমর্থনে তাদের চিৎকার ধ্বনিতে সমস্ত বনাঞ্চল প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। তারপর প্রবীণ মোড়ল কিত্তা দাঁড়িয়ে উঠে ধীরে ধীরে বিবরণ দিতে থাকল যে আড়কাঠিরা কি সর্বনাশ করছে। নিখোঁজ সাঁওতাল জোয়ানদের হদিশ পাওয়ার জন্য কিত্তা অনেক ঘুরে মেদিনীপুর শহরে পৌঁছয়, তারপর একজন

বাঙালী উকিলের সাথে কলকাতায় যায়। কলকাতায় গিয়ে সে সাঁওতাল জোয়ানদের দেখতে পায়নি, কিন্তু দেখে এসেছে কিভাবে জাহাজের খোলের মধ্যে বন্দী করে সাঁওতাল, বাঙালী ও বিহারী গরীব মানুষদের প্রলোভন দেখিয়ে সমুদ্রপারে দ্বীপের মধ্যে বাগিচার কাজে চালান করে। রানীগঞ্জের ধারে কয়লার খাদে সাঁওতালদের দুর্দশার গল্প সে করল। মহাজন, আড়কাঠি ও সায়েব পাদ্রীদের ফন্দী ফিকিরের কায়দাকানুন সমস্ত সে প্রকাশ করল এবং তাদের সকলের আড়ালে সবচেয়ে বড় দুশমন সায়েবদের কথাও সে তুলল। সবার শেষে সিধু সকলের মত নিয়ে সমাজদ্রোহী সাঁওতালদের সমাজ থেকে বের করে দেওয়ার রায় জাহির করল এবং গল্প করল যে কি করে এবং কি অদ্ভুত বীরত্বের সংগে বাংলাদেশের ২৪ পরগণায়, ফরিদপুরে এবং দেশের পশ্চিমপ্রান্তে ওয়াহাবী ও অন্যান্য কৃষকেরা জমির জন্য নীলকর, জমিদার, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে চলেছে। সে ঘোষণা করল, "হামরা সাঁওতালেরাও বহু-লেড়কি ঘরবাড়ি আওর জমিন লিয়ে গরীব বাঙ্গালী গরীব বিহারী আওর মোমিনদের সঙ্গে মিল্লত করব আওর লঢ়াই চালাব।" উল্লাসপূর্ণ হুঙ্কারের মধ্যে সে রাতের শিকারের সভা শেষ হল। ছোট বড় দলে ভাগ হয়ে শিকারীরা খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করতে থাকল। তখনও চাঁদের আলো মিলিয়ে যায় নি, তখনো বোশেখের দমকা হাওয়ায় সমগ্র বনাঞ্চল স্পন্দিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আঠারো-শো চুয়ান্ন সালের গ্রীষ্মকাল থেকেই একের পর এক অভাবনীয় অনেক কিছু ঘটতে শুরু হল। ঠিক এই সময়টায় সাঁওতালদের বড় মোড়লদের কেউই দামিন-ই-কো এলাকার মধ্যে ছিল না। সিধু বারহাইতের প্রবীণ মুসলমান তাঁতি রহমত মোল্লার সঙ্গে তখন পাটনায় গিয়েছে—পাটনায় ওয়াহাবী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য। তারপর তার ইচ্ছে গঙ্গাপারে পাবনা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার নীলচাষের এলাকাগুলো পরখ করে দেশে ফিরবে। কানহু, কিত্তা, সুন্নু প্রভৃতি মোড়লেরাও দামিন-ই-কোর বাইরে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুঙ্গের, হাজারিবাগ এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল এবং মুণ্ডা কোল প্রভৃতি সাঁওতালদের ঘনিষ্ঠ আদিবাসীদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য বেরিয়ে পড়েছে। সাঁওতাল এবং আদিবাসীদের গোটা এলাকাটাতেই তখন দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে আরো অনেকখানি এগিয়েছে, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তার পাতা শেষ হয়েছে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সমাপ্ত হয়েছে, প্রথমে রানীগঞ্জ এলাকায় এবং পরে এদিকে-সেদিকে কয়লার খাদে রীতিমত কাজ শুরু হয়েছে। এই এলাকা থেকে কাঠের চালান শুরু হবার পর আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জমি থেকে আদিবাসী কৃষকদের উচ্ছেদ পুরো তোড়ে চলছে, আড়কাঠিরা এই গোটা

এলাকাটাতেই প্রলোভনের ফাঁদ পেতে গরীব বেকারদের চালান দিতে শুরু করেছে, সর্বত্রই অসন্তোষের ছায়া।

দামিন-ই-কো এলাকার লিটিপাড়া গ্রাম। বিকেল হলেও পড়ন্ত রোদ্দুরে মাঠগুলো তখনো ঝাঁঝাঁ করছে। তবুও কিন্তু তিলকী ভকতের আড়তের কাছে বড় মহুয়া গাছটার তলায় বহু লোক এসে জমায়েত হয়েছে। এ কোনো আগে থেকে আয়োজন-করা সভা বা সমাবেশ নয়, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সমবেত ক্রুদ্ধ লোকের সেই জনতায় গোলমাল ক্রমেই বেড়ে চলল। একজন বুড়ো সাঁওতাল বুক চাপড়ে বলছে, "জানিস্, তিলকী হামারে কয়—হামার জমিন আর হামার লেই, হুইটা এখন তিলকীর। পিছলা সালের বাদলার দিনের কর্জা চাউল শীতের সময়ে কোড়ায় গোণ্ডায় শুধে দিয়েছি আওর বেইমান কয় হেই কর্জার দায়ে হামার জমিন এখন উয়ার। বেইমানটা কয় যে ইংরেজ কুম্পানীর আদালত হেই হুকুম দিছে।" এক এক করে সমবেত সকলেই সেই একই গল্প করল যে তারাও জেনেছে তাদেরও জমি আদালতের রায়ে হয় তিলকী নয় ঈশরী ভকতের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে।

সেই ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতাকে কে যে প্রথম আড়তদারদের গদির দিকে পরিচালিত করল ভবিষ্যতে কোনও অনুসন্ধানই তার পাত্তা করতে পারেনি। আসলে হয়তো কেউই তাদের পরিচালিত করেনি, জনতা ক্রুদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে কোন লুঠতরাজের মনোভাব ছিলনা, হঠাৎ কিন্তু সেই জনতা গর্জন করতে করতে সবেগে ধাবিত হল এবং মহাজনদের গদি চড়াও

করল। ঘটনার শেষে যখন সাঁওতাল জনতা ফিরে চলে গিয়েছে, তখন দোকান গদি ঘর একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ক্রুদ্ধ জনতা শুধু ভেঙেছে, ছিঁড়েছে এবং ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলেছে। সাঁওতালরা কোনও লুঠতরাজ করেনি।

গ্রামের পর গ্রামে এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা ঘটতে থাকল। দিঘী থানার নামকরা অত্যাচারী মহেশ দারোগার জুলুম সঙ্গে সঙ্গে শতগুণ বেড়ে উঠল। মহাজনদের সঙ্গে এবং পাকুড়ের রাজার সঙ্গে সলাপরামর্শ করে মহেশ দারোগা বিভিন্ন এলাকা থেকে বাছাবাছা সাঁওতাল জোয়ান ও মোড়লদের গ্রেপ্তার করে ডাকাতির দায়ে মহকুমায় ও সদরে চালান দেওয়া শুরু করল।

ইংরেজী বছরের শেষ দিকে মাঠে তখনো ফলন্ত শস্য দাঁড়িয়ে আছে। হাজার দুর্দশার মধ্যেও গাঁয়ে গাঁয়ে সাঁওতালদের গলায় গানের গুঞ্জন উঠেছে, নতুন শস্য সকলের মনেই নতুন আশা ও ভরসা এনেছে। হঠাৎ চূড়ান্ত আঘাত এল যখন লছিমপুর, বোরো, সিঁধরী, বাগসিসা, দরিয়াপুর প্রভৃতি গ্রামের কৃষকরা জানতে পারল যে তাদের হাতের তৈরি মাঠের ফসলে তাদের কোনও হক নেই, এ সবই তাদের কর্জার দায়ে মহাজন ও জমিদারদের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। বারহাইত গ্রামে দামিন-ই-কো এলাকার হর্তাকর্তা পন্টেট সায়েবের কাছারির বাগানে ক্রুদ্ধ সাঁওতাল জনতা জমায়েত হতে লাগল। সমস্ত বারহাইত গ্রামে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পন্টেট সায়েব আত্মগোপন করে রাজমহলে পালিয়ে গিয়েছে,

মহাজনেরা সকলেই নিজের নিজের গদি ও আড়ত বন্ধ করে সরে পড়েছে! কাছারির বাগানে, হাটের ফাঁকা জায়গাটাতে বারহাইতের পথে পথে শুধু ক্রুদ্ধ কৃষকের ভিড়। বড় নেতারা কেউই নেই;—তারা তখন বিভিন্ন দূর দূর এলাকায় পরামর্শ ও সংগঠনের কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ কিন্তু একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্রমে রাত হয়ে আসে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়।

হঠাৎ শেষ রাত্তিরে শীতের মধ্যে যখন ঘরের ভিতর সমস্ত মানুষ ঘুমন্ত সেই সময়ে এল অপ্রত্যাশিত আক্রমণ। পন্টেট সায়েব ও রিচার্ডসন সায়েব রাজমহল ও ভাগলপুর থেকে ফৌজ নিয়ে এল, দিঘীর মহেশ দারোগা এবং পাকুড় রাজের নায়েব পুলিশ ও লাঠিয়াল নিয়ে সমবেত হল, মহাজনরা ও তাদের ফড়েরা এক এক করে বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে চলল। বিস্তীর্ণ গ্রাম এলাকা জুড়ে এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার চলল এবং পরের দিন সকালে গ্রেপ্তার করা সাঁওতাল জোয়ান ও মোড়লদের কোমরে দড়ি বেঁধে চালান দেওয়া হল।

ভাগলপুরের আদালতে বিচারের প্রহসন শেষ হল। আসামীদের বিরুদ্ধে কোনও স্থানীয় সাক্ষী পাওয়া যায়নি। তাতে কিন্তু ইংরেজ হাকিমের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্যন্ত সাজা দিতে মোটেই বাধল না। মহকুমা হাকিম থেকে আরম্ভ করে জেলা হাকিম মায় ছোট-লাট পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে চূড়ান্ত সাজা দিলেই

সাঁওতালরা শায়েস্তা হবে। তাই আইনের কোনও পরোয়া না করেও চূড়ান্ত সাজা দেওয়া হল।

সাধারণ ধরপাকড়ের দিন থেকে আরম্ভ করে অনেক সাঁওতাল জোয়ান তখন আত্মগোপন করে আছে। এই ভয়ানক অন্যায় এবং বীভৎস শাস্তির সংবাদ গোটা সাঁওতাল এলাকাতেই এক প্রচণ্ড আলোড়ন নিয়ে এল। তখন ইংরেজী ১৮৫৫ সাল। সাঁওতাল এলাকা থেকে ক্রুদ্ধ এবং আকুল আহ্বান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল,—বিরাট জাতীয় বিপদের দিনে আদিবাসীরা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে শাল গাছের পাতা-ওয়ালা ডাল পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে থাকে। উত্তর ভারতের রাখীর আবেদনের চেয়েও এই পাতাওয়ালা শালগাছের ডালের আবেদন অনেক বেশি গভীর, শুধু গভীর নয়, এ আহ্বান অমোঘ। বহু হাজার বছর আগে থেকে অরণ্য জীবনের যুগে এই আহ্বান রক্ত-সম্পর্কযুক্ত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমবেত করত। এবারও প্রমাণিত হল সাঁওতালদের এই আদিম অরণ্যজীবনের আহ্বান অমোঘ। তখন সিধু, কানহু প্রভৃতি সমস্ত মোড়লেরাই স্বস্থানে ফিরেছে। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন জাঠার পর জাঠায় সাঁওতালরা ভাগনাদিহি গ্রামে জমায়েত হতে লাগল। উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ সমস্ত দিক থেকেই, ময়ূরভঞ্জের কোণ থেকে আরম্ভ করে হাজারীবাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে মিছিলের পর মিছিল এসে জমায়েত হল। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন, ভাগনাদিহির মাঠে পিঠে

ধনুক বেঁধে এবং হাতে বর্শা ও কুড়ুল নিয়ে সমবেত হল বিশ হাজার আদিবাসী এবং গরীব বাঙালী ও বিহারী জোয়ান। আজকে তাদের দিকে লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় যে তারা একটা উদ্দেশ্যহীন জনতা নয়, তারা অহেতুক চিৎকার ধ্বনি করছে না, তারা যেন প্রতীক্ষা করছে। কঠোর সংগ্রামের জন্য সমবেত দৃঢ়সংকল্প সৈন্যবাহিনীর মত সত্যি সত্যিই তারা লড়াইয়ের আদেশের প্রতীক্ষা করছিল।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন সকাল বেলা। ভোর থেকেই সমস্ত আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এবার বর্ষা আরম্ভ হয়েছে আষাঢ়ের শুরু থেকেই। সকাল থেকেই সিধুর বাড়ির সামনে গোবর-লেপা মহুয়া ও আম গাছের তলায় সাঁওতাল মাজি পরগণাইত ও ঠাকুরদের সভা বসেছে। সমস্ত এলাকার মোড়লেরাই হাজির। সাঁওতাল ও বাঙালী জোয়ানদের নেতাদের মধ্যে মংরা, কালু প্রভৃতি আমন্ত্রিত হয়ে সভায় হাজির হয়েছে; জোয়ানদের নেতাদের মধ্যে বীরসিং মাজির সবল সুঠাম সুদীর্ঘ চেহারা আজ আর দেখা যাচ্ছে না, কারণ ডাকাতির অপবাদে বীরসিং ও ডোমন প্রভৃতি অনেক জোয়ান এখন ভাগলপুর জেলে বন্দী এবং বাকি জোয়ানদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় যারা এসেছে তারাও সকলে ফেরারী আসামী। পন্টেট সায়েবের বাড়ির বিহারী ও বাঙালী চাকরদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে সিধু, কানহু, কিস্তা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বড় বড় মোড়লদের নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। স্বভাবত শান্ত প্রকৃতির সাঁওতাল

মোড়লেরা আজকের সভায় বেশ একটু উত্তেজিত, শুধু সিধুর সুদীর্ঘ চেহারার মধ্যে একটা স্থির সংকল্পের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামের অপর প্রান্তে ছোট শালবনের ধারে দূর দূরান্তর থেকে জাঠার পর জাঠায় সাঁওতালেরা আসছে, সভাস্থল থেকে একই সঙ্গে তাদের কলরোলের সঙ্গে আষাঢ় মাসের মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছে।

কিত্তা মোড়ল তখন দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক ভাঙা গলায় বলছে, "কাল রাতে জঙ্গলের মধ্যে বড় বোঙার স্থানে হামি স্নু ও সিধুকে লিয়ে মোরগা বলি দিলম, পুছলম,—বোঙা, তুই বল হামরা কি করতি পারি। দুশমনরা হামাদের ডাকাইত বদলাম দিয়ে কয়েদী বনাতে চায়। তুই বল হামরা কি জমি জেরাত ছেড়ে বহু-লেড়কা ফেলে জেল-খানায় বন্দী থাকব? আশমানে বাদল গর্জায়, বিজলি ঝিলিক মারে, বড় বোঙার নিঃশ্বাসের ঝড়ে সমস্ত শালগাছ দোলে। যেতবার হামরা পুছি যে বোঙা তুই জবাব দে,— আশমান গর্জায়, বিজলী চমকায় আর শালগাছগুলিন দোলে। হামরা বুঝলম যে বোঙা হুকুম দিছে, তুরা লঢ়াই কর। ঘরে ফিরে নিদ গেলম, সাথে সাথে বড় বোঙা সপন দিল আওর হুকুম ভি দিল : খবরদার, লিজেদের হাতে তৈরি জমিজেরাত ঘরবাড়ি ছোড়বি নি, জান কবুল তুরা লঢ়বি। সপন দেখে নিদ ছুটে গেল—একদৌড়ে সিধুর বাড়ীতে এলম, দেখলম সিধু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হামি কুছু কইবার আগেই সিধু হামারে কইল, মোঢ়ল, হামরা লঢ়ব।"

প্রবীণ বয়স্ক, সদাসর্বদা সাবধানী, ধীর স্থির এবং সাঁওতালদের মধ্যে লেখাপড়া জানা কিন্তু মোড়লের ভাঙা গলায় এই কথাগুলো সমস্ত সভার মধ্যে একটা অত্যন্ত ব্যগ্র উন্মুখভাব এনে ফেলল। সকলেই প্রতীক্ষা করতে লাগল যে এবার তাদের সর্বজন প্রিয় নেতা সিধু তার কথা বলবে এবং সাঁওতাল সমাজের দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ দেখাবে।

অনেকদিন আগে পন্টেট সাহেবের দরবারে সিধু সকলকে চমকিত করে দিয়েছিল। সেদিন ওর দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল ও যেন শালকাঠ এবং পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে, ওর বড়বড় শান্ত গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল যে হাজার হাজার বছরের অরণ্য-জীবনের রহস্য ওর চোখে জমা হয়ে আছে, পন্টেট সায়েবের জবাবে ওর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল যে ও পথের সন্ধান জানে। আজ গভীরতম জাতীয় বিপদের ঘনঘটার মধ্যে সমস্ত সাঁওতাল মোড়লেরা তার কথার প্রতীক্ষা করতে থাকল। সিধু অত্যন্ত শান্তভাবে, একরকম সমাহিতভাবে আস্তে আস্তে তার বক্তব্য শুরু করল, "এই দুবছরে হামি অনেক ঘুরেছি, অনেক মুলুক দেখেছি, অনেক গুণী আদমির সঙ্গে কথা বলেছি, লিজেও অনেক কুছু সোচবার সমঝাবার চেষ্টা করেছি। ত্রিশ সাল আগে মেদিনীপুর জেলা ও ময়ূরভঞ্জ থেকে যেখুন হামাদের উচ্ছেদ করে, তেখুন হামরা শুরুতে জঙ্গলে পালাই। লিজেদের জমিন লিয়ে হামরা লড়িনি, শেষমেষ জঙ্গলেও থাকতে

পারলম নি। তারপর পথে পথে কাটিয়ে হেইখানে বন কেটে মেট্টি থেকে কাঁকর সাফ করে লিজেদের হাতে জমিন বানায়েছি। মেদিনীপুরে সায়েব কুম্পানী শুরুতে হামাদের খেদিয়েছে, পরে বাঙ্গালী চাষীদের জমিনও বরবাদ করিয়েছে। হামরা মিল্লত করিনি, একসাথ লড়াই ভি করিনি। ময়ূরভঞ্জে তীর ধনুক লিয়ে হামরা আলাইদা লড়াই করেছিলম, কিন্তুক হার হয়ে গেল। হেইখানে তিন সাল আগে যেখুন মহাজন জিমিদার আর সায়েবরা একজোট হইয়ে হামাদের উপর চড়াও করল, তেখুন হামরা ঠিক করলম যে সোমাজ ভাঙতে দিবক লেই, আওর ভি ঠিক করলম সাঁওতাল, গরীব দিকু আওর গরীব বিহারীর মিল্লত চাই। এই জোরেই হামরা তিনসাল খাড়া আছি, আজ দুশমনরা তাই হামরার উপর বেপরোয়া হামলা শুরু করেছে। দুশমনরা হামরার মোড়ল ও জোয়ানদের কয়েদ করতি চায় কেনে? দুশমনরা হামরার মিল্লত ভাঙতে চায়, হামরার জমিন কেড়ে লিতে চায়, হামাদের সেরেফ কুলি আওর জানোয়ার বানাতে চায়।” সিধুর শান্ত কণ্ঠস্বর গর্জে উঠে চিৎকার করল, “হামরা রাজি লই, হামরা জমিন ছাড়বক লেই, হামরা মিল্লত ভাঙতে দিবক লেই। হামরা লড়ব।” সমগ্র সভা সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল “হামরা লড়ব।”

সিধু বলতে থাকল, “কিন্তুক লড়াই কি করিয়ে হোবেক? ঠিক যেখুন মেদিনীপুর থেকে হামাদের উচ্ছেদ কোরে, তেখুন ২৪ পরগণায় আওর ফরিদপুরেও বাঙালী কিসানদের উচ্ছেদ

হোয়। তারা কিন্তুক জমিন ছাড়ে লাই। ফরিদপুরে দুদু মিঞাকে মোড়ল করে কিসানেরা জিমিদার আওর কুম্পানীকে খেদিয়ে দেয়। ২৪ পরগণায় ভি তিতুমীরকে মোড়ল করে কিসানেরা দুশমনদের খেদায়। তারপর সায়েবরা ফৌজ আওর কামান বন্দুক লিয়ে আসে। সামনা সামনি লড়ায়ে কামান বন্দুকের খেলাপে কিসানদের হার হোয়। তাই হামি যেখুন পাটনায় ওয়াহাবীদের মোড়লদের সঙ্গে মোলাকাৎ করি, তেখুন উরা বুললে যে হামরার লড়ায়েও কায়দাকানুন চাই। সবসে পয়লা হামাদের কি করতি হোবে? হামাদের ইলাকায় গাঁয়ের মধ্যে কোনও দুশমন থাকতে দিবক লেই,—জিমিদার লয়, নায়েব গোমস্তা লয়, মহাজন ব্যাপারি লয়, সায়েব লয়, দারোগা পুলিস লয়, জাতভাইদের মধ্যে বেনেগড়ির পাদ্রীদের সঙ্গে যারা মিল্লত করেছে উদেরকেও হামরা ইলাকার মধ্যে থাকতে দিবক লেই। তারপর খুব জরুরী জিনিস সোচবার সমঝাবার আছে। হামরা কামান বন্দুকের খেলাপ সোজাসুজি খোলা ময়দানে লড়াই কোরবক লেই। দুদু মিঞা আর তিতুমীর হেই কাম করে পারলক নেই। হামাদের জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে, রাতের আঁধারেও হামাদের মহড়া করবার আদত আছে। যেখুন ফয়দা বুঝবো তেখুন হামরা বড় দল লিয়ে লড়াই করব, আবার যেখুন বড় দল লিয়ে লড়াইয়ে ফয়দা নেই তেখুন ছোট্ট ছোট্ট দলে ভাগ হয়ে, দুশমনদের হায়রান করব। কেখুনো হামাদের ঘেরাও করতি দিবক লেই। তারপর দুশমনদের

ফন্দিসন্দির খবরও হামাদের চাই, হামাদের হেই উপগারটো দিকুদোস্তদের করে দিতে হোবে।”

সিধুর শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জোয়ানেরা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, “আমরা তোদের সমস্ত খবর জোগান দিই, পরেও নিশ্চয় দেব।”

সিধু তখন ভাতু মোড়লকে তার পরামর্শ দেবার জন্য আহ্বান জানাল।

সাঁওতালদের মধ্যে ভাতু সবচেয়ে প্রাচীন মোড়ল,—তার শরীরের বাঁধন ঢিলে হয়ে এসেছে, গলার স্বরও জোরালো নেই, কিন্তু ধার্মিক ও বিবেচক হিসেবে সকলের মধ্যেই তার রীতিমত ইজ্জৎ আছে। ভাতু বলল, “এক হপ্তা হররোজ হামি বড় বোঙার স্থানে বলি দিছি, আর হররোজ রাতে বড় বোঙা সপন দিছে, তার গলার আওয়াজ ভি শুনেছি। সাতসাতটা রাত্তির একই সপন, একই সপন। বড় বোঙা আগেকার চাইতে অনেক বড় হয়েছে। তার মাথা হোই আশমানে গিয়ে ঠেকেছে। বড় বোঙার গায়ের রঙ ভি সায়েবের চেয়ে ধলা। বড় বোঙা হামারে কয়—বর্ষা বাদলের মরশুমে লড়াই সুরু করতি হোবে আওর সায়েবদের হাত থেকে ছিনিয়ে বন্দুক লিয়ে ভি লড়তে হোবে। বড় বোঙা কয়, যিখানেই লড়ায়ে সাঁওতাল জান দিবে সিখানেই বোঙার স্থান হোবেক আওর সাঁওতালদের দুশমনদের কেখুনো মনে শান্তি আসবেক লেই।”

ভাতুর কথা সমস্ত সভার মধ্যে প্রচণ্ড গাম্ভীর্য নিয়ে

এল, মোড়লদের মধ্যে সকলেই একথা উপলব্ধি করল যে না লড়লে সব কিছু বরবাদ হবে, কিন্তু লড়লে শেষমেষ সাধারণ মানুষের জিত হবেই। মোড়লদের সভায় স্থির হল যে ভাগনাদিহির মাঠে সমবেত জনতার মধ্যে থেকে সংগ্রামের ঘোষণা করতে হবে, সাঁওতাল ছাড়াও অন্যান্য আদি-বাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, নীল চাষী আর ওয়াহাবীদের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, এবং ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ ঘোষণা করে প্রকাশ্য ফতোয়া দিতে হবে।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন। বেলা গড়িয়ে প্রায় বিকেলের দিকে এলেও আকাশে মেঘের ঘনঘটা এখনো কাটেনি। গতকালের বৃষ্টির জলে গোমানী নদীতে দুকূল ছাপিয়ে বান ডেকেছে। ভাগনাদিহির প্রান্তরে জমায়েতে বিশ হাজার সাঁওতালের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝেই নেতাদের সমর্থনে গর্জে উঠছে। সমবেত জনতার গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে শালগাছের আন্দোলিত পত্রমর্মর আর ভাগনাদিহির গাঁয়ের মেয়েদের মঙ্গলধ্বনির আওয়াজ। কিত্তা মোড়ল সাঁওতালদের স্বাধীনতার লিখিত ঘোষণা পড়ে শোনাবার পর সমগ্র জনতা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার ধ্বনিতে সমর্থন জানাল। দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সাঁওতাল জোয়ানদের দৃঢ়সংবদ্ধ মাংসপেশী ফুলে ফুলে উঠছে, মাঝে মাঝেই তারা হাতের টাঙি ও কুড়ুল আন্দোলিত করছে। সিধুর বক্তৃতার পর যখন সভা শেষ হল তখনো সমবেত জনতার কানে সিধুর শেষ কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,

"এই মুলুক হামরার মুলুক। সাঁওতাল, মেহনতি বাঙালী, বিহারী আওর মোমিন জোলাদের মধ্যে কোনও ফারাক লেই, কোনও ফারাক হামরা আসতে দিবক লেই। সোব দুশমনদের হেই মুলুক থেকে খেদাব। বড় বোঙার হুকুম জরুরত মাফিক জান দিব আওর জান লিতে ভি হোবে। সায়েবরা বরবাদ, জিমিদার মহাজন বরবাদ, লীলকর বরবাদ।" সিধুর বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশ ভেঙে আষাঢ়ের ঘন বর্ষা নেমে এল, জোয়ানদের কণ্ঠে তখনও উল্লাসের ধ্বনি গর্জন করছে, ভাগনাদিহি গ্রাম থেকে মেয়েদের মঙ্গলধ্বনি তখনও দিকদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তারই সঙ্গে সভাস্থলে শতশত মাদল একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রায় একশো বছর আগেকার কথা, তখন গঙ্গা ছিল একেবারে ভাগলপুর শহরের গা ঘেঁষে। ১৮৫৫ সালের জুলাই মাস। আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকেই গঙ্গা কূলে কূলে ভরে উঠেছে, এপার থেকে ওপারের তটভূমি স্পষ্টভাবে ঠাওর করা যায়না, প্রবল জলস্রোত ঘুরপাক খেয়ে চলছে। এখন বিকালবেলা। স্বাভাবিক সময় হলে এই বর্ষাকালের প্রবল ও বিস্তীর্ণ জলস্রোত পার হয়ে নৌকায় চড়ে সাধারণ লোক ওপারে যেতে ভয় পায়, এমন কি মাঝিরাও সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে ওপারে যেতে অস্বীকার করে। আজ কিন্তু ভাগলপুরের পারঘাটে অসংখ্য মানুষের ভিড় এবং অনেক খোলা ও ছই-দেওয়া নৌকো নিয়ে মাঝিরা হাজির। ঘাটে সমবেত জনতার বেশভূষা দেখলে তাদের ধনী ও সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হয়, তাদের মধ্যে কয়েকটি মেমসায়েব কাচ্চাবাচ্চা ও আয়া নিয়ে সমুপস্থিত। ঘাটে সমবেত মানুষের মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এই ভিড় হচ্ছে পলাতক মানুষের ভিড়। বন্যাপুষ্ট গঙ্গার প্রবল জলধারা এবং অপর পারের অনির্দিষ্ট ছায়ারেখার চাইতে এরা বেশি ভয় করছে ভাগলপুর শহরের অত্যন্ত সুপরিচিত, এককালের নির্বিঘ্ন নিরাপদ পরিবেশকে। এইমাত্র হাকিম রিচার্ডসন সায়েবের মেম ছেলেমেয়ে ও আয়াকে নিয়ে ভাওলে চড়ে ওপারের দিকে যাত্রা শুরু করল। যাত্রীদের সঙ্গে মাঝিদের দর কষা-

কষি সমানে চলেছে, আজ যে-কোনও দর হেঁকেও মাঝিদে
পক্ষে যাত্রী পাওয়া শক্ত নয়।

পারঘাট থেকে শহরের ভিতর দিকে চলতে শুরু করলেই অভিনবত্ব উপলব্ধি করা যায়। পথে-পথে বন্দুকধারী সিপাইরা টহল দিচ্ছে, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও সচকিতভাবে চলাফেরা করছে। ভাগলপুরের চীফ কমিশনার ব্রাউন সায়েবের বাংলোর সামনে বেশ একটু ভিড়। পারঘাট থেকে ব্রাউন সায়েবের বাংলোতে আসবার পথে জেলখানার পাঁচিলের একটা অংশ দেখা যায়। সেখানে বন্দুকধারী সিপাই রীতিমত কুচকাওয়াজ করে টহল দিচ্ছে এবং কয়েকজন গোরা অফিসার তদারক করছে।

ব্রাউন সায়েবের বাড়ির ভিতরে সায়েবের খাসকামরায় একটা টেবিলের দুপাশে চেয়ারে বসে রিচার্ডসন ও পন্টেট সায়েব তখন রীতিমত তর্ক করছে। খাসকামরায় কমিশনার সায়েব এখন অনুপস্থিত, তাঁর নিজস্ব টেবিল চেয়ার খালি রয়েছে, অন্দরমহলের কোনো একটা ঘর থেকে মাঝে মাঝে ব্রাউন সায়েবের চড়া সুরের দুএকটা কথা শোনা যাচ্ছে। ব্রাউন সায়েব যেন তাঁর মেমকে কিছু একটা বোঝাতে চাইছেন কিন্তু কিছুতেই পারছেন না।

রিচার্ডসন ও পন্টেট সায়েবের কথাবার্তার সুর পর্দায় পর্দায় চড়তে শুরু করল এবং শীঘ্রই একটা অশোভন ঝগড়ায় পরিণত হল। পন্টেট সায়েব কেবলি বলছে যে অন্যায়ভাবে, এমন-কি বিনা সাক্ষীপ্রমাণে সাঁওতাল আসামীদের দ্বীপান্তরে

সাজা দেওয়ার জন্যই বিদ্রোহ শুরু হয়েছে এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী রিচার্ডসন। আর রিচার্ডসন বলছে যে মহাজন, জমিদার ও দারোগাদের নিয়ে সাঁওতালদের সমস্ত মূল অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফন্দীফিকির পন্টেট সায়েবই করেছে এবং সেইজন্য এই বিদ্রোহের মূল দায়িত্ব পন্টেট সায়েবেরই। ঝগড়া যখন ঠিক হাতাহাতিতে পরিণত হবার মত অবস্থায় তখন অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে ব্রাউনসায়েব ঘরে ঢুকে তাঁর নিজস্ব চেয়ারে বসলেন। ব্রাউন সায়েবের খাস নায়েব একটা মোটা ফাইল নিয়ে এসে তাঁর সামনে টেবিলের উপর রাখল। ব্রাউন সায়েব ঘরে ঢুকতেই পন্টেট ও রিচার্ডসনের চিৎকার থেমে গিয়েছিল। তারা দুজনেই দাঁড়িয়ে ব্রাউন সায়েবকে সম্মান দেখিয়ে তাঁর কথার প্রতীক্ষা করতে থাকল।

ব্রাউনসায়েব মোটা ফাইল থেকে একখানা কাগজ বের করে বললেন, “সত্যি ঘটনা কিংবা তামাশা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই দেখ, সাঁওতাল বেটাদের ঘোষণাপত্র, এ একেবারে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা। এই ঘোষণাপত্র ওরা আমার কাছে এবং তাছাড়াও আশপাশের সমস্ত জেলাহাকিমদের কাছে পাঠিয়েছে। বেটারা বলছে যে কোম্পানীর রাজত্ব আর রইল না এবং এখন থেকে দেশ হল ওই ও-বেটাদের, জমিদার মহাজনেরা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগী না হলে ওরা তাদের জোর করে দেশছাড়া করবে, কেবলমাত্র এদেশে থাকতে পাবে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী জাতি এবং গরীব বাঙালী ও বিহারী। এরকম ঘটনা কখনো তোমরা কল্পনা করতে

পেরেছ ? সাঁওতালদের যুদ্ধঘোষণা !" তারপর ফাইল খুলে তিনি একটার পর একটা কাগজ তুলে দেখাতে শুরু করলেন, "এই দেখ লোকের হাত দিয়ে একটার পর একটা রিপোর্ট আসছে যে থানার পর থানা এবং জমিদারদের কাছারিগুলো সাঁওতালরা দখল করছে, নীলকুঠিও সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের সব বীরপুঙ্গবেরা নিজের নিজের স্টেশন ছেড়ে পালিয়ে ভাগলপুর শহরে হাজির, বাইরের বৈঠকখানা ঘরে আমি পলাতক হাকিম, দারোগা, নীলকর সায়েব ও জমিদারদের সন্ত্রস্তভাব ও কথাবার্তা শুনে একেবারে হয়রান হয়ে গিয়েছি। হুঁঃ, তীরধনুক কামানের সাথে লড়বে ! এক হপ্তায় ঠাণ্ডা করে দিতে পারি, তবে বর্ষাকালে এখন পথ চলাচল শক্ত হয়ে পড়ায় কিছুটা দেরি হতে পারে। আমি মার্শাল ল জারি করে ওদের শায়েস্তা করব। কিন্তু ও বেটারা বিদ্রোহ করতে গেল কেন ? আমি কিছুতেই ভেবে ব্যাপারটা ঠিক করতে পারছিনা।"

পণ্টেট সায়েব হঠাৎ বলে উঠলেন, "প্রায় কুড়ি বছর আমি এদের মধ্যে আছি, এত শান্ত নিরীহ মানুষ যে বিদ্রোহ করতে পারে একথা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তবে আমি গত বছর মহেশ দারোগাকে বলেছিলাম যে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমরা খাজনা বাড়িয়ে দিলাম, মহাজনরা দিনে ডাকাতি করার মত সাঁওতালদের জমিজেরাত সর্বস্ব নিয়ে নিতে শুরু করল, নীলকুঠি আর রেলওয়ের সায়েবরা সাঁওতাল মেয়ে নিয়ে প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী করল। তখনই

আমি চাকরদের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে গাঁয়ে গাঁয়ে জটলা হচ্ছে......"

পণ্টেট সায়েব কথা শেষ করতে না করতেই হাকিম রিচার্ডসন দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাতে শুরু করলেন, "আপনার ভণ্ডামী অসহ্য। আপনি এবার নিশ্চয় বলতে শুরু করবেন যে শেষমেষ সাঁওতালদের দ্বীপান্তরের হুকুম আমি দিয়েছি এবং সেইজন্যই বিদ্রোহ......।" পণ্টেট সায়েবও উত্তেজিত ভাবে জবাব দেবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠতেই কমিশনার সায়েব বললেন, "মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে হে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আর তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এই কদিনের ঘটনার রিপোর্ট তোমরা দু'জনেই পড়েছ। কিন্তু আজকের ঘটনার রিপোর্ট এত সাংঘাতিক যে আর এক মূহূর্তও অপেক্ষা করা চলেনা। তোমাদের দুজনকে এক্ষুণি রাজমহলে যেতে হবে এবং সেখানে শহর রক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করতে হবে। খুব হুঁশিয়ার থাকবে। সব সময়ে মনে রেখো যে দশ থেকে ত্রিশ হাজার সাঁওতাল হাতিয়ার নিয়ে গ্রাম, থানা, জমিদারের বাড়ি ও কাছারি এবং নীলকুঠি সব দখল করতে শুরু করেছে।"

পণ্টেট ও রিচার্ডসন সায়েব সেলাম করে বিদায় নিতে না নিতেই ভাগলপুরের মিলিটারির কর্তা মেজর বারোজ হাজির হলেন, বারোজের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি বললেন :

"আপনি নিশ্চয় শুনেছেন যে ভাগলপুর জেলে দ্বীপান্তর যাত্রী সাঁওতাল কয়েদীদের কালকের রাতের হল্লার কারণ

জানা গিয়েছে। সাঁওতালদের নেতা সিধু বাঙালী চর মারফত তাদের খবর পাঠিয়েছে যে সে শীঘ্রই জেল ভেঙে তাদের উদ্ধার করা হবে। জেলের ওয়ার্ডাররা এত ঘাবড়ে গিয়েছে যে তারাও এই খবর চেপে রেখেছিল। আজ একজন ওয়ার্ডার মারফত এই খবর পেয়ে আমি ঘণ্টাদুয়েক হল জেলখানার চারদিকে ফৌজ মোতায়েন করেছি এবং সমস্ত শহরে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বন্দুকধারী শান্ত্রী মোতায়েন করেছি। এইমাত্র সমস্ত নিজে তদারক করে আপনার কাছে এলাম।"

ব্রাউনসায়েব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন, "আমি যে ভাবছিলাম তোমাকে সমস্ত ফৌজ নিয়ে সরাসরি বিদ্রোহ-দমনের জন্য রাজমহলের দিকে পাঠাব! এখন কি করা যায়?"

মেজর বারোজ বললেন, "সাঁওতাল বিদ্রোহীরা এখনো ভাগলপুর থেকে অনেক দূরে। আর ভাগলপুর শহর রক্ষা করা তেমন শক্ত ব্যাপার নয়। ঘোঘা ও চন্দন এই দুটো নালার ঘাটগুলো সামলাতে পারলেই সাঁওতালদের শহরে ঢোকা বন্ধ করা যাবে; আর এই ঘাটগুলো সামলাতে একশোর বেশি বন্দুকধারী পুলিশ লাগবেনা। আমি আপনাকে একশো বন্দুকধারী পুলিশ কিংবা ফৌজ এক্ষুণি দিতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে যে সৈন্য আছে তা দিয়ে এই বর্ষার সময়ে তিরিশ হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহীদের কিছুই করা যাবেনা। তাই চারদিক থেকে ফৌজ আনবার জন্য এখুনি ব্যবস্থা করুন।"

ব্রাউন সায়েব বললেন, "কলকাতায় লাটসায়েবকে আমাদের নতুন টেলিগ্রাফ লাইন মারফত তার করে সব খবর জানিয়েছি এবং সাহায্য চেয়েছি। দানাপুরে সেনাপতি লয়েড সায়েবের কাছে একটা পুরো ফৌজ এক্ষুণি পাঠাবার জন্য খবর পাঠিয়েছি ; আর মুঙ্গের, পাটনা, বহরমপুর, বাড় প্রভৃতি আশপাশের সমস্ত হাকিমদের বিশদ খবর জানিয়েছি এবং তাদের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছি……।" এমন সময়ে দুটি বাচ্চা ছেলের হাত ধরে ব্রাউন সায়েবের মেম ঘরে ঢুকে তীব্রস্বরে বলতে শুরু করলেন, "রিচার্ড-সনের মেম পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে নৌকো চড়ে গঙ্গাপার হয়ে গেল, আর তুমি আমাদের কিছুতেই যেতে দিলেনা……।" এমন সময়ে মেমসায়েবের আর্তস্বর ছাপিয়ে আপিসের বাইরে প্রচণ্ড চিৎকার এবং আর্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্মচারী খাসকামরায় এসে হাজির হল। ব্রাউনসায়েব ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে কর্মচারী এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বলতে শুরু করল, "অসংখ্য পলাতক কুঠির বাইরে হাজির হয়েছে, মহেশ দারোগা এবং অন্যান্য অনেক দারোগা খুন হয়েছে, এবং দামিন-ই-কো এলাকার প্রায় পুরোটাই বিদ্রোহীদের দখলে। বারহাইত, অম্বর, পাঁচখেত, পাকুড় প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্ভ্রান্ত লোকেরা হুজুরের কাছে আর্জি পেশ করতে এসেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় গোটা এলাকা থেকে জমিদার মহাজন হাকিম পুলিশ চৌকিদার সকলেই পলাতক।"

ব্রাউন সায়েব উত্তেজিত হয়ে দাঁড়ালেন এবং চেঁচিয়ে বললেন, "তোমার যা ফৌজ আছে তাই নিয়েই বেরিয়ে পড় বারোজ, কাহালগাঁওয়ের পথ ধরে যাও, মনে রেখো বিদ্রোহীদের ক্ষমা করতে নেই। আমি তোমার জন্য শীঘ্রই সবরকমের সাহায্য পাঠাচ্ছি……।" সেলাম করে যখন মেজর বারোজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তখনো দুটি বাচ্চা শিশুর হাত ধরে ব্রাউনসায়েবের মেম কাঁপছে আর আর্তস্বরে চিৎকার করছে……

নবম পরিচ্ছেদ

তখনো কলকাতাই ভারতবর্ষের রাজধানী। তাই সেখানে শুধু বাংলার লাটসায়েব নয়, ভারতবর্ষের বড়লাট সায়েবও তাঁর সমস্ত আপিস কর্মচারী নিয়ে বসবাস করতেন। কলকাতার ইতিহাসে এমন দুজন ধূর্ত ও কর্মক্ষম বড়লাট ও ছোটলাটের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না ; ডালহৌসী তখন বড়লাট এবং হ্যালিডে সায়েব ছোটলাট। ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সাঁওতাল বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ আসার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সরকারী মহলে দারুণ আতঙ্ক ও কর্মচাঞ্চল্য। গোটা সাঁওতাল এলাকাটা তখনকার দিনে বাংলার লাটের তত্ত্বাবধানেই ছিল।

হ্যালিডে সায়েব এইমাত্র বড়লাটের সঙ্গে গোপন পরামর্শ সেরে নিজের প্রাসাদে খাস-কামরায় এসে বসেছেন। তাঁর সঙ্গেই ফোর্ট উইলিয়মের প্রধান সেনাপতিও এসেছেন। গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগের বড়কর্তারা এবং ছোটলাটের চীফ সেক্রেটারী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীও হাজির।

ঘরের একদিকে দেওয়ালে অনেকগুলো ছোট বড় ম্যাপ টাঙানো রয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ও তীর দিয়ে চিহ্নিত করা সাঁওতাল অঞ্চল এবং আশপাশের এলাকার একটা মস্ত বড় ম্যাপ। ছোটলাট সায়েব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এই ম্যাপের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং একটা ছড়ি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কতখানি

এলাকা সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছে। বস্তুত গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও ভাগীরথী নদীর মধ্যেকার প্রায় গোটা এলাকাটাই তখন বিদ্রোহীদের দখলে। উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে কিছু কিছু এলাকা, খাস ভাগলপুর শহর প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা প্রবেশ করতে পারে নি। ম্যাপের কাছ থেকে হ্যালিডে সায়েব আবার ফিরে এসে তাঁর খাস টেবিলের ধারে চেয়ারে বসলেন।

ছোটলাট সায়েব গোয়েন্দা বিভাগের কর্তার দিকে তাকাতেই তিনি তাঁর ফাইল খুলে বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগা অংশগুলি পড়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন :

"এই দেখুন কোলদের এলাকা থেকে কি সাংঘাতিক খবর এসেছে,—১৮৩০ সালের কোল বিদ্রোহ দমনের পরেও অসন্তোষ কোনও দিনই মিটে যায় নি, এখন কোন রকমে সাঁওতালরা কোলদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেই শুধু কোল কেন ছোটনাগপুরের সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। তাই এদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য এক্ষুণি ব্যবস্থা করা চাই······"

তারপর তিনি আরেকটা রিপোর্ট বের করে পড়ে শোনালেন, "সাঁওতাল এলাকার মধ্যে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে সমস্ত নীলকুঠি তো ধ্বংস হয়েছেই, কিন্তু সেটা আসলে তত বিপদের কথা নয়। এই দেখুন ভাগীরথীর পূর্ব দিকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বারাসত, পাবনা সর্বত্রই নীলচাষীরা শুধু অসন্তুষ্ট নয়, তারা বিদ্রোহের জন্য প্রায় প্রস্তুত। যদি

সাঁওতাল বিদ্রোহীরা ভাগীরথী পার হয়ে নদীর পূর্বদিকের এই সব নীলচাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, তাহলে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। তাই সাঁওতালদের ভাগীরথী নদী পার হওয়া ঠেকাতেই হবে।"

"তারপরে এই দেখুন, সবচেয়ে সাংঘাতিক রিপোর্ট হচ্ছে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে,—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সীমান্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়াহাবী যোদ্ধাদের মৃতদেহ দেখে আমাদের লোকেরা প্রথমে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমাদের গোয়েন্দারা খবর পায় যে বাংলাদেশের গোটা দক্ষিণ পূর্ব অংশ থেকে শুরু করে এবং বিহারকে কেন্দ্র করে সীমান্তপ্রদেশ পর্যন্ত ওয়াহাবীদের গুপ্ত সংগঠন রয়েছে। সাঁওতাল মোড়লদের একটা গোপন বৈঠকের খবর পাদ্রী সায়েবদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে,—তাতে বেশ বোঝা যায় যে ওয়াহাবী নেতাদের সঙ্গেও সাঁওতাল নেতাদের কথাবার্তা হয়েছে, লড়াই সম্পর্কে ওয়াহাবী সেনাপতিদের অনেক অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ সাঁওতাল নেতারা মেনে নিয়েছে। তাই দরকার হচ্ছে সাঁওতালদের সঙ্গে ওয়াহাবীদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা..."

ছোটলাট সায়েব তাঁর ধূর্ত, কটা চোখ তুলে ফোর্ট উইলিয়মের প্রধান সেনাপতির দিকে তাকালেন এবং ধীরে ধীরে বললেন, "ব্যাপারটা যে কি রকম সঙ্গীন তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা করার কোনও দরকার করে না।

লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে আপনি নিজেই হাজির ছিলেন। এক্ষুণি আমাদের লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি (কৌশল) ঠিক করে কাজ শুরু করতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহকে বিচ্ছিন্ন করা অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়া। তার জন্য এই গোটা এলাকা-টাকেই সৈন্যবাহিনী দিয়ে ঘেরাও করতে হবে এবং গঙ্গা ও ভাগীরথী নদী জাহাজে টহল দিয়ে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখতে হবে। কত সৈন্য আপনি চটপট যোগাড় করতে পারেন?"

ফোর্ট উইলিয়মের কর্তা গম্ভীর ভাবে বললেন, "আমাদের দপ্তরে প্রধান প্রধান লোকদের নিয়ে পরামর্শ করে দেখলাম যে সবশুদ্ধ একলাখ সৈন্য ও পুলিশ এবং যথেষ্ট সংখ্যায় দূর-পাল্লার কামান ও নদীতে পাহারা দেবার জন্যে কমপক্ষে কুড়ি-খানা জাহাজ এবং শ'খানেক বড় ছিপ আমাদের লাগবেই..."

সেনাপতি সায়েব তাঁর কথা শেষ করবার আগেই ছোট-লাট সায়েবের ঘরের বাইরে ছোটলাটের খাস চাপরাশী এসে দাঁড়াল, ছোটলাটের ইঙ্গিতে চীফ সেক্রেটারী হন্তদন্ত হয়ে বাইরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এসে রিপোর্ট করলেন, "বাইরের ঘরে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আপনার প্রতীক্ষা করছেন,—তাঁদের মধ্যে আছেন মুর্শিদাবাদের নবাব সায়েব, কয়লাখনির মালিকদের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি, কয়েকজন রেল-কোম্পানীর ডিরেক্টর, 'ভারতবন্ধু' ও 'কলিকাতা রিভিউ'-এর সম্পাদক এবং বিভিন্ন এলাকার নীলকুঠির হোমরাচোমরা কয়েকজন কর্তা......"

ছোটলাট সায়েব চীফ সেক্রেটারীর বাকি কথাবার্তা থামিয়ে বললেন, "ভালই হয়েছে ওঁরা এসেছেন, তুমি ওঁদের অপেক্ষা করতে বল, আমরা কথাবার্তা শেষ হলেই বাইরের ঘরে হাজির হব।"

তারপর তিনি তাঁর ধূর্ত চোখ মেলে আরেকবার গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা ও সেনাপতির দিকে তাকালেন এবং বলতে শুরু করলেন ঃ

"তারপরের কাজ হচ্ছে আমাদের নিজেদের লোকের মধ্যে আতঙ্ক দূর করা। আরে ছ্যা ছ্যা, কমিশনার ব্রাউনের কাণ্ডটা দেখেছ? সাঁওতাল নেতাদের জন্য দশ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছে, রীতিমত মার্শাল ল জারি করেছে এবং একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। আমি ব্রাউনের জায়গায় বীডওয়েলকে চাই। তেমনি ওই আহাম্মক মেজর বারোজটাকেও সরাতে চাই,—কামান বন্দুক এবং গোরা সৈন্য নিয়ে সাঁওতাল তীরন্দাজদের কাছে খোলাখুলি ময়দানে যুদ্ধে হেরে গেল? দানাপুর থেকে সেনাপতি লয়েডকে এবং মেজর শাকবুর্গকে আনিয়ে সাঁওতাল এলাকার ভিতরকার লড়াই চালাতে হবে। পুরস্কার ঘোষণার কোনো দরকার নেই; যদিও আমি সাঁওতাল নেতাদের ধরবার জন্য দশ হাজার কেন কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার দিতেও রাজি এবং মার্শাল ল জারি না করেও সেই মাফিক কাজ চালাতে প্রস্তুত। বাঙলাদেশের মধ্যিখানে একটা যুদ্ধ চলছে, এই ব্যাপারটা কিছুতেই জাহির হতে দেওয়া যায় না, কারণ তার ফল ইংরেজের প্রেস্টিজের

(মান ইজ্জতের) পক্ষে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। আমার মনে অবশ্য একটুও দ্বিধা নেই যে প্রত্যেকটি বিদ্রোহী সাঁওতালকে শেষ করতে হবে, সাঁওতাল এলাকার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করতে হবে এবং বিদ্রোহী এলাকার সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের ইংরেজী কায়দাকানুন মাফিক ঘোষণার মধ্যে দয়া, মহানুভবতা প্রভৃতি বুলি রাখতে হবে। এই হচ্ছে মোটমাট আমার লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি, বড়লাট সায়েবেরও এই মত।"

সমস্ত কথাবার্তা ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী নোট করে নিলেন। কথার শেষে হ্যালিডে সায়েব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল এবার বৈঠকখানা ঘরে যাওয়া যাক।"

বৈঠকখানা ঘরে তখন দু-তিনটে ছোটবড় দলে ভাগ হয়ে অতিথিরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছেন। ছোটলাট সায়েব ঘরে ঢুকেই পরস্পর সম্মানজ্ঞাপনের পালা শেষ হতেই সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরকে আহ্বান করে কথা শুরু করলেন, "নবাব বাহাদুর, আজকের দিনে আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু সাহায্যের আশা রাখি।" নবাব সায়েব তাঁর জমকালো বেশভূষা সমেত সম্ভ্রমের সাথে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "গোলাম কোম্পানীর রাজত্বের জন্য সব কিছু করতেই প্রস্তুত আছে। হালফিল আমি পঞ্চাশটা হাতি মাহুত সমেত মুর্শিদাবাদের হাকিমের কাছে পাঠিয়েছি। এটাকে কোম্পানীর কাছে আমার একটি সামান্য উপহার হিসেবে মেহেরবাণী করে গ্রহণ করুন। এই হাতি দিয়ে

বর্ষার দিনে যেমন কামান, গোলা-গুলি ও অন্যান্য মালপত্র টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তেমনি সম্ভব এ হাতিগুলোকে মদ খাইয়ে একটু মাতাল করে বিদ্রোহী গ্রামের ঘরবাড়ি ভূমিসাৎ করা।" এই কথা বলে প্রশস্ত নবাবী কায়দায় কুর্নিশ করতেই ছোটলাট সায়েব সবেগে এগিয়ে এসে নবাব সায়েবের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, "নবাব বাহাদুর, আপনি সত্যিই আমাদের খাঁটি বন্ধু। কিন্তু একথাও মনে রাখবেন যে এই সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা শুধু কোম্পানীর স্বার্থ নয়, এই এই বিদ্রোহ দমন হলে তবেই আপনারও নবাবী ও জমিদারী টিঁকে থাকবে।" ঘরের মধ্যে সমর্থন ও প্রশংসার একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। এই সময়ে "ভারত বন্ধু"র সম্পাদক দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "স্যর, ইংরেজের প্রেস্টিজ খাস কলকাতা শহরেও খুব নিচুতে নেমে গিয়েছে, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের দাম হু হু করে নেমে যাচ্ছে। আমাদের পক্ষে খবরের কাগজ মারফত কার্যকরী প্রচার চালানো অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার হয়ে উঠেছে। আপনার কাছ থেকে আজই কিছু টিপস্ (উপদেশ) চাই।"

অবস্থার সঙ্গীনতা সত্ত্বেও ছোটলাটের ধূর্ততা মাখানো চোখেমুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আজকে এখানে ধনী, জমিদার, নবাব সায়েব প্রভৃতি সকলেই হাজির। আমি প্রত্যেকের কাছ থেকেই সশস্ত্র পাইক বরকন্দাজ এবং অর্থ ও রসদের দাবি রাখি।" উপস্থিত সকলেই সাৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের নিজের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

জানাল। তারপর ছোটলাট সায়েব আবার তাঁর কথা শুরু করলেন, "আমি সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জোর গলায় একথা বলতে পারি যে দরকার হলে একলাখ পর্যন্ত সৈন্য এই বিদ্রোহ দমনের কাজে লাগানো হবে, বিদ্রোহীদের একজনও রেহাই পাবে না, বিদ্রোহী এলাকার সমস্ত ফসল ধ্বংস করা হবে, বিদ্রোহীদের সমস্ত গ্রাম ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে। এবং শুধু সাঁওতাল নয়,—তাদের সঙ্গে যে সব গরীব বাঙালী ও বিহারীরা মিলিত হয়েছে, তাদেরও সমানভাবে শায়েস্তা করা হবে। রিপোর্ট পেয়েছি যে ত্রিশ হাজার অস্ত্রধারী বিদ্রোহী ওই এলাকায় আছে, এদের মধ্যে শুধু বিশ্বাসঘাতক ছাড়া একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। বিদ্রোহী এলাকায় বিদ্রোহ দমনের পর যারা বেঁচে থাকবে তাদের কারুর মেরুদণ্ড সোজা থাকতে দেওয়া হবে না।"

ছোটলাট সায়েব তাঁর উত্তেজিত বক্তৃতা শেষ করেই যখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, তখন বৈঠকখানা-ঘরে বেশ একটু উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

মেজর বারোজ সশস্ত্র ফৌজ নিয়ে কাহাল গাঁও-এ পৌঁছেই চর মারফত খবর পেলেন যে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের একটা বড় দল ভাগলপুরের দিকে এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে কয়েক জায়গা থেকে খবর এসেছে যে পথিমধ্যে বিদ্রোহীরা বল্‌বড্ডা প্রভৃতি কয়েকটা নীলকুঠি একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছে। চরদের খবর থেকে মনে হয় যে বিদ্রোহীদের এই দলটা ভাগলপুর জেল থেকে সাঁওতাল বন্দীদের মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসছে।

ভাগলপুর জেলায় গঙ্গার ধার ঘেঁষে একফালি পলিমাটির জমি দেখা যায়। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে এই অঞ্চলটুকু ছোটনাগপুর এলাকার মাটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। খাস ছোটনাগপুর এলাকার জমি শক্ত এবং কাঁকর ও পাথরে ভর্তি আর নদীর ধারে এই অংশটুকু গঙ্গার পলি থেকে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই রীতিমত বর্ষা এসে পড়ায় কাহাল গাঁও থেকে পীরপৈঁতি পর্যন্ত পথঘাট কাদায় ভর্তি এবং ভারী মালপত্র চলাচলের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে। মেজর বারোজ ঠিক করলেন যে পীরপৈঁতি থেকেই বিদ্রোহীদের দমন করা সোজা। মেজর বারোজের সঙ্গে বন্দুকধারী সৈন্য ছাড়াও কয়েকটা দূর পাল্লার কামান এবং যথেষ্ট সংখ্যক গোরা অফিসার রয়েছে।

পীরপৈঁতির কাছে সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে তখন খবরদারীর ভার লেফটেনান্ট জোন্‌সের উপর। আকাশ তখন ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন, টিপটিপ করে বহুক্ষণ থেকে বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে দূর থেকে সাঁওতালদের ঢাকের কড়া বাজনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বিদ্রোহীরা খুব দূরে নয়, এবং চরদের সমস্ত খবর একত্র করে জোন্‌সের সুস্পষ্ট ধারণা হল যে বিদ্রোহীরা বনজঙ্গল ও গাছপালার আড়াল দিয়ে সাবধানে এগিয়ে এসে তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। এই রিপোর্ট জোন্‌স এক্ষুনি লোক মারফৎ মেজর বারোজের কাছে পাঠিয়েছে এবং সৈন্য শিবিরের চারদিকে পাহারার ব্যবস্থা খুব কড়া করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

সৈনিকের কর্তব্য পালন করবার পরে জোন্‌সের চোখের দৃষ্টি বেশ একটু ভাবালু হয়ে এল। আজকে সে দেশ থেকে বহুদূরে মেহনতী মানুষের বিদ্রোহ দমন করার জন্য অফিসারের ভূমিকায়। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রায় ষোল বছর আগের একটি দিনের কথা যখন সে নিজে বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়ে গান গেয়ে মার্চ করে চলেছিল। লেফটেনান্ট জোন্‌সের ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে। সে লিখতে শুরু করল:

“কি আশ্চর্য মিল। ওয়েলসে যেখানে আমার বাড়ি এবং যেখানে আমার প্রথম যৌবন কেটেছে সেটা হচ্ছে কয়লার খনি আর লোহাশিল্পের এলাকা। আর এই এলাকাটাও ইতিমধ্যেই কয়লাখনির এলাকা হয়ে উঠেছে।

এবং এখানেও লৌহশিল্প গড়ে উঠবার সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে। আমার মনে পড়ছে ১৮৩৯ সালে আমাদের চার্টিস্ট আন্দোলনের* কথা। নেতা ভিনসেণ্টের কারাদণ্ডের পরে এবং জেলখানায় তাঁর উপর নিপীড়নের কাহিনী ছড়িয়ে পড়বার পরে আমরা শ্রমিক বিদ্রোহীরা তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করবার জন্য রীতিমতো সৈন্যবাহিনীর কায়দায় মার্চ করে চলেছি নিউপোর্ট শহরের পথে। আমরা তখন গান গাইছি ঃ

“আকাশ চিরে বিজলী চমকায়
ডঙ্কানাদে বজ্র দেয় হাঁক
মানেনা যারা শোষিতদের দাবি
নেইকো ক্ষমা, পুড়িয়ে কর খাক্।
এবার তবে লড়াই হল শুরু
হুইগ, টোরী পাজিরা হুঁশিয়ার
মজুর লড়ে হকের ময়দানে
একতা তার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।**

---

* রবার্ট ওয়েন দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ও'কোনোর, লোভেত, ও'ব্রায়েন, ভিনসেণ্ট, হার্নি প্রভৃতি নেতাদের দ্বারা পরিচালিত ইংলণ্ডের শ্রমিকদের মূল দাবি নিয়ে জঙ্গী আন্দোলন। (১৮৩৬-১৮৪৯)

**The lightning flashing through the sky,
The thunder loud roars after,
O, scorch, burn the oppressors ! Why ?
Because they withhold the charter.

"সেদিন চৌঠা নভেম্বর। আমাদের দেখে নিউ পোর্টের পুলিশ এবং স্পেশাল কনস্টেবলরা পালাতে আরম্ভ করল। ইংলণ্ডের জমিদার ও ধনীদের সরকারের ভাড়াটে বাহিনী হঠাৎ গুলি চালাতে আরম্ভ করল আমাদের উপর। তখনো আমাদের গানে দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়েস্ট গেট হোটেলের সামনে দশজন চার্টিস্টের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল এবং প্রায় পঞ্চাশ জন গুলি-বিদ্ধ আহত হোটেলের সামনের চত্বরে শুয়ে পড়ল। ঠিক আমার পাশেই আঠারো বছর বয়েসের জর্জ শেলের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তার রক্তাক্ত বুকপকেট থেকে পেলাম ঠিক আগের দিন রাত্রিতে লেখা তার মা-বাপের কাছে শেষ বিদায়ের পত্র। সে চিঠিতে সে লিখেছিল: আমি এই রাত্রিতেই স্বাধীনতার জন্য গৌরবময় সংগ্রামে অংশ নিতে চলেছি এবং যদি ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে; কিন্তু যদি আর দেখা না-ও হয় তাহলেও আমার জন্য দুঃখ কোরো না, কারণ এক মহান আদর্শের জন্যই আমি প্রাণ দিয়েছি বলে জানবে। বিদায়!

"আজ এই এলাকার শুধু সাঁওতাল নয়,—সাঁওতাল,

Then rise, my boys, and fight the foe,
Your arms are truth and reason.
We'll let the Whigs and Tories know
That union is not treason.

বিহারী ও বাঙালী সমগ্র মেহনতী জনতার বাহিনী ভাগলপুর জেলের দিকে চলেছে সেখানকার জেলখানায় বন্দী নেতাদের ছাড়াবার জন্য। সেদিন আমি ছিলাম বিদ্রোহী, আর আজ আমি এখানে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঘাঁটি আগলাচ্ছি। আমার পাশে মাটিতে লুণ্ঠিত সেদিনকার জর্জ শেলের রক্তাক্ত মৃতদেহ আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।"

এর পরে লেফটেনান্ট জোন্‌সের ডায়েরিতে কয়েকটা দিন ফাঁক পড়ে আছে। তার কারণ ঠিক পরের দিনই অর্থাৎ ষোলই জুলাই পীরপৈঁতিতে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ে মেজর বারোজের সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এরপর লেফটেনান্ট জোন্‌সকে বদলি করে দেওয়া হয় মেজর শাকবুর্গের বাহিনীতে। ঠিক এই সময়টায় বাংলার ছোটলাট এবং ফোর্ট উইলিয়মের কর্তাদের সংগঠিত প্রচেষ্টায় চারদিক থেকে বিদ্রোহী এলাকার উপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। দানাপুর থেকে সেনাপতি লয়েড বিদ্রোহী এলাকার মধ্যে ঘাঁটি করে বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ ভাঙবার জন্য নিযুক্ত হলেন। মুর্শিদাবাদের জেলা হাকিম একটা বড় রকম সেনাবাহিনী নিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের মর্মস্থল ভাগনাদিহির দিকে এগোতে লাগলেন। বীরভূমের দিক থেকে এবং গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড জুড়ে দলে দলে ফৌজ এগিয়ে এল।

ষোলই জুলাই তারিখে পীরপৈঁতির লড়াইয়ে সাঁওতাল

বাহিনীর কাছে পরাজিত হবার পর এতদিন পর্যন্ত জোন্‌স কোনও ফুরসৎ পায়নি। আজকে রাত্রে সে হুকুম পেয়েছে যে নদীপথে জাহাজ চড়ে একটা বাহিনী নিয়ে আগামীকাল তাকে মুর্শিদাবাদের জেলা হাকিমের বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তখন মুর্শিদাবাদের হাকিমের ফৌজের সঙ্গে রাজমহলের আশপাশের এলাকায় কানহুর নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহীদের প্রায় প্রত্যহই সজ্ঘর্ষ হচ্ছে। দূর-পাল্লার কামান এবং বন্দুকধারী বড় রকমের ফৌজের সঙ্গে খোলা ময়দানে সম্মুখ-সংগ্রামের কৌশল ত্যাগ করে সাঁওতাল নেতারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শত্রুবাহিনীগুলোকে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে জেরবার করার কৌশল নিয়েছে। তারই জবাবে কোম্পানীর সেনাবাহিনীগুলোর সংগ্রামের নতুন কৌশল হয়েছে সাঁওতাল গ্রামগুলিকে ধ্বংস করা। মুর্শিদা-বাদের হাকিমের উপর কড়া হুকুম এসেছে, ভাগনাদিহি গ্রাম ধ্বংস করা চাই। আগামী কাল সকালে মুর্শিদাবাদের হাকিমের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যাত্রা করার আগে আজ রাত্রে আবার জোন্‌স ডায়েরি লিখতে বসেছে :

"ষোলই জুলাই থেকে এই কয়েকটা দিন কি অদ্ভুত ভাবেই না কাটল। ষোলই জুলাই-এর লড়াইয়ের কাহিনী আমি ওয়েলসের পুরনো শ্রমিকবন্ধুদের কাছে পাঠাতে চাই, তাই সমস্ত ব্যাপারটা তাজা থাকতেই লিখে ফেলা দরকার,—কাল আবার ঘটনাচক্র আমাকে অন্যপথে নিয়ে চলেছে।

ষোলই তারিখে দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই আমি বুঝতে পারলাম যে আমার রাত্রের আন্দাজ হুবহু ঠিক। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা তখন তিনদিক দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলেছে—নদীপথ দিয়ে হটে যাওয়া অথবা কাহালগাঁও-এর দিকে পেছিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের সামনে তখন একটিমাত্র পথ হচ্ছে কামান ও বন্দুকের জোরে বিদ্রোহী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করা। মেজর বারোজ সেই হুকুমই দিলেন। দুপুরবেলাতেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে, বিশেষত কামান-বন্দুকের বিরুদ্ধে সেকেলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহীদের এরকম লড়াইয়ের কথা আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারি নি। ১৮৩৯ সালে নিউপোর্ট শহরের রাস্তায় এবং ১৮৪৮ সালে এপ্রিল মাসে লণ্ডনের রাস্তায় বিদ্রোহের ঝাণ্ডা কাঁধে করে আমরাও চলেছি। কিন্তু এ লড়াই সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। খুব সম্ভবত একমাত্র প্যারিসের মেহনতী মানুষই এই ধরনের লড়াই করতে পারে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তারপরও আবার জুন মাসে প্যারিসের পথে পথে এমনি মরণপণ লড়াই চলেছে।

"পীরপৈঁতিতে আমাদের কামান-বন্দুক ও গোলাগুলির সংখ্যা অফুরন্ত ছিল বললেই হয়। দুপুরবেলাতে আমাদের কামান-বন্দুকগুলো বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল। ঘণ্টাখানেক পরে সেই লোহা ও আগুনের বৃষ্টিধারার মধ্যে থেকে আমরা জীবন্ত অথবা উৎসাহী বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হব বলে

কল্পনা করতে পারি নি। আমাদের দূরবীণ আছে আর ওদের শুধু স্বাভাবিক চোখের নজর! একঘণ্টা অবিশ্রান্ত গোলাগুলি ছোঁড়া শেষ হবার পর আমরা উপলব্ধি করলাম যে আমাদের আক্রমণ ওরা একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছে, এই সমস্ত সময়টা ওরা ফাঁক ফাঁক হয়ে থেকে, গাছের আড়ালে থেকে এবং মাটিতে শুয়ে পড়ে আমাদের আক্রমণকে বহুলাংশে এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সময়টাই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে শুধু আমাদের গোলন্দাজদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছে এবং গোলন্দাজদের মধ্যে অনেকেই ঘায়েল হয়েছে। এখন আমাদের গোলাগুলির আওয়াজ থামবার সঙ্গে সঙ্গে এক-সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকটা ঢাকের তীব্র আওয়াজ বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-আক্রমণ শুরু হয়ে গেল আমাদের বিরুদ্ধে। আমরা সেই আক্রমণ ঠেকাতে পারলাম না। অনেক গোরা-অফিসার ও দেশী সৈন্যের মৃতদেহ এবং কামান-বন্দুক ফেলে আমাদের নদীপথে স্টীমারে চড়ে পালাতে হল। সমস্ত ঘটনাটা দিনত্বপুরে ঘটলেও একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। রক্ত-মাংসের শরীরওলা মানুষে যে এরকম লড়াই করতে পারে তা আমরা কেউ ভাবিনি,—আমি কিন্তু মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছি যে নিজেদের জমি ও স্বাধীনতার জন্য মেহনতী মানুষই একমাত্র এ-ধরনের লড়াই করতে পারে এবং এ ধরনের লড়াই যারা করতে পারে শেষ পর্যন্ত তাদের জিত হবেই।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

২০শে জুলাইয়ের মধ্যেই বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর তালডাঙ্গা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাঁইথিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার উপরে অবস্থিত রাজমহল থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছে। বিদ্রোহীরা যাতে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও দামোদর নদ পার হয়ে কোলমুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের সাথে যোগস্থাপন করতে না পারে তার জন্য রাজগড়ের ঘোড়সওয়ার বাহিনী খোদ বড়লাটের রক্ষী-বাহিনী, বহু হাতি ও ঘোড়াসমেত মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ফৌজ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনীত সব রকমের সৈন্যবাহিনী প্রতি-আক্রমণের মহড়া করছে। পূব দিক থেকে মুর্শিদাবাদের হাকিম একটা গোটা ফৌজ নিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের মর্মকেন্দ্র ভাগনাদিহি ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে এলেন। ২৪শে জুলাই বারহারোয়া-বারহাইত শড়ক ধরে কোম্পানীর ফৌজ এগিয়ে এল। সামনে একদল বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার এগিয়ে চলেছে, প্রায় ত্রিশটা হাতি দূরপাল্লার কামানগুলো টেনে নিয়ে চলেছে এবং গ্রাম ধ্বংসের জন্য আরো গোটা বিশেক হাতি গোটা সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যেই সম্মুখযুদ্ধের কায়দা ছেড়ে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল নিয়েছে। রঘুনাথপুরের কাছে ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কানহু ও চাঁদের নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী আচমকা

শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু তারা বেশিক্ষণ লড়াই না চালিয়ে আবার জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। প্রত্যেকটি ছোট বড় জঙ্গল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে মুর্শিদাবাদের এই বাহিনীকে জেরবার করতে লাগল। কিন্তু প্রচুর বন্দুক কামান এবং ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সাহায্যে ফৌজের দল এগিয়ে এসে বারহাইত দখল করে ফেলল। পন্টেট সায়েবের হেডকোয়ার্টার বারহাইত ইতিপূর্বে বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছিল। বারহাইত দখল করার পর এখান থেকে ঘোড়সওয়ার হাতি এবং পদাতিক বাহিনী ভাগনাদিহি ধ্বংসের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সাঁওতাল জোয়ানেরা তখন গ্রাম থেকে হটে গিয়ে চারদিকের ছোট বড় জঙ্গলে এবং দলদলি পাহাড়ে ওঁৎ পেতে বসে আছে। গ্রামে পুরুষের মধ্যে শুধু বুড়ো আর শিশু, বাকি শুধু মেয়েরা। এদেরি উপর প্রথম অতর্কিত বন্দুকের গুলি ও কামানের গোলা দাগার পর, একদল মাতাল হাতি নিয়ে গোরা অফিসারদের নেতৃত্বে সৈন্যেরা ঘরবাড়ি ভাঙতে ভাঙতে ও জ্বালাতে জ্বালাতে এগিয়ে চলল। বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার বাহিনী চারদিকে টহল দিতে থাকল। মানুষের আর্তস্বর আর গরু-মোষের ব্যাকুল চিৎকার একসঙ্গে মিশে গেল। তারি মধ্যে গোরা অফিসারদের উল্লাসধ্বনি হুররে হুররে শোনা যেতে থাকল। মাতাল হাতিগুলো একটার পর একটা কুটির ভাঙে আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় "হুররে"। ঘরের ভিতর থেকে ব্যাকুল হয়ে বুড়ো শিশু ও মেয়েরা বেরিয়ে

আসে আর সঙ্গে সঙ্গে গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। যুবতী মেয়েদের ধরে অফিসারদের উল্লাস বীভৎস হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত গ্রামের উপর আগুনের শিখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মংরা, কালু, নন্দা, ভজু, কাওলে প্রভৃতির নেতৃত্বে সাঁওতাল জোয়ানেরা গ্রামের লোকেদের সাহায্যের জন্য বুকে হেঁটে এবং গুটি মেরে বন্য জন্তুর মত এগিয়ে আসতে থাকল! গ্রাম থেকে তখনো গরু-মোষ-ছাগলের আর্তনাদের সঙ্গে ছোট ছেলেদের ও মেয়েদের আর্তনাদ মিলিয়ে যায়নি। হঠাৎ নতুন ধরনের আর্তনাদ শোনা গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে ফৌজদের বিঁধতে থাকল। সারা রাত ধরে এইভাবে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে সাঁওতাল জোয়ানেরা বনের মধ্যে ফিরল এবং মুর্শিদাবাদের ফৌজ গ্রাম ধ্বংস করে বারহাইতের মূল ঘাঁটিতে ফিরে গেল।

ভোরবেলায় তখনো বারহাইতের পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি থেকে ভাগনাদিহি গ্রামের উপরে ঘন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। লেফটেনান্ট জোন্স এইমাত্র পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। তার সারা শরীর তখন রি রি করছে। গোরা অফিসারদের বীভৎস কাণ্ডের কথা স্মরণ করে সে তখন নিজেদের সভ্যতা সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠেছে। ডায়েরিতে কিছু লিখতে না পারলে আজ তার মনে হচ্ছে সে পাগল হয়ে যাবে :

"আজকে আমার মনে পড়ছে হার্নির লেখা প্রবন্ধ ও

বক্তৃতা। ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে চার্টিস্ট বিদ্রোহ দমনের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিত ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ-সম্রাট লুই বোনাপার্টি স্পেশাল কনেস্টবল হিসেবে নিজের নাম লিখিয়েছিল। দেশবিদেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়া তখন ইংলণ্ডের মেহনতী জনতার বিপক্ষে একত্র হয়েছিল। মুর্শিদাবাদী ফৌজের ঘাঁটিতে এসে দেখলাম যে এখানেও সাঁওতাল, বাঙালী ও বিহারী মেহনতী জনতার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে শুধু ইংরেজরাজ নয়, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর থেকে আরম্ভ করে আশপাশের সব কজন জমিদার, নীলকর ও কয়লাখনির কর্তারা একত্র হয়েছে। হাতি ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে গোলাগুলি ও খাদ্য সরবরাহের কী সমারোহ! তারি সঙ্গে মনে পড়ছে কালকের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী। সায়েব অফিসাররা যে এইভাবে সাঁওতাল মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারে তা আগে কল্পনাও করিনি। আর মেয়েদের চোখে সে কী ঘৃণার দৃষ্টি! বিদ্রোহী নেতা সিধুর ঘর জ্বালাবার সময়ে যে মেয়েটি কুড়ুল হাতে করে আমাদেরি একজন অফিসারকে আঘাত করল—সে দৃশ্য ভোলবার নয়। তারপর আঘাতে আঘাতে হতচেতন সেই মেয়েটির উপর পাশবিক অত্যাচারও আমি কিছুতে ঠেকাতে পারলাম না। আমি যখন আমাদেরই পক্ষের লোককে হত্যা করতে হবে বলে মনে মনে স্থির করেছি, ঠিক সেই সময়ে লক্ষ্য করলাম যে মেয়েটি ইতিপূর্বেই মারা গিয়েছে।

"আমাদের অফিসারদের এই পাশবিকতার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে বিদ্রোহীদের নেতা সিধু ও কানহুর কথা। এই কদিন আগেই, জনকয়েক সাঁওতাল বিদ্রোহী যখন হেনেসি সাহেব ও তাঁর দুই ছেলে এবং মিসেস টমাস ও মিস পেল এ-দুজন ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করে, তখন বিদ্রোহী নেতারা কেউ সেখানে হাজির ছিল না। সাহেব মেমেরা হাতি ও ঘোড়ায় চড়ে বিলের মধ্যে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল এমন সময়ে সাঁওতালরা তাদের ঘেরাও করে হত্যা করে। অবশ্য তারা হত্যা ছাড়া পাশবিক অত্যাচার করেনি। বিদ্রোহীদের নেতা কানহু ও সিধু এই হত্যাকাণ্ড তো সমর্থন করেই নি, উপরন্তু তারা দোষীদের নিজেদের হাতে সাজা দেয়। তাই আমি ভাবছি যে শুধু কি কামান-গোলা-গুলির জোরে দুর্নীতির জয় হবে?

"কার্ল স্ক্যাপার অথবা হার্নি কাউকে সামনে পেলে এই প্রশ্নই আমি করতাম, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য টিঁকবে কি? ভারতের দৌলতে আমাদের দেশে ওরা আমাদের মজুর আন্দোলন ধ্বংস করছে আর আমাদের মত মজুরের হাত দিয়ে এদেশের মেহনতী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করছে। কতকাল এভাবে চলবে?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভাগনাদিহি গ্রামে ২৪শে জুলাইয়ের সেই বীভৎস রাত্রিতে সাঁওতাল জোয়ানদের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। গাঁয়ের আশেপাশে জঙ্গলে ও পাহাড়ে আত্মগোপন করে বিদ্রোহীরা কল্পনা করেছিল যে লড়াই শুধু উভয়পক্ষের ব্যাটাছেলে যোদ্ধাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ঘরবাড়ি জ্বলতে দেখে এবং আর্তনাদ শুনে তারা ছোটছোট দলে গ্রামের লোকদের বাঁচাবার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ কাউকে বাঁচাতে তারা পারেনি। শুধু কিছু হতাহত মেয়েপুরুষ নিয়ে তারা জঙ্গলে ফিরে এসেছে।

সিধুর বাড়ির কাছে যখন কাওলে, মংরা ও কালুর নেতৃত্বে তিন দল জোয়ান তিনদিক দিয়ে হাজির হয় তখন সুখিয়া মারা গিয়েছে এবং আরো কয়েকটা হতাহত দেহ ছড়িয়ে আছে। সাহেব ও দেশী ফৌজেরা তখনও উল্লাসে মত্ত। এমন সময়ে কাওলের দল অতর্কিতে টাঙি ও কুড়ুল নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয় এবং সেই সুযোগে মংরা ও কালুর দলের জোয়ানেরা সুখিয়া ও অন্যান্য হতাহতদের নিয়ে জঙ্গলে ফিরে আসে। কাওলের দলের কেউ ফেরেনি।

দল্‌দলি পাহাড়ের আড়ালে প্রিয়জনদের মৃতদেহ ঘিরে বিদ্রোহীরা তাদের নেতা কানহুর নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকল। সুখিয়ার রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশে মংরা তখন দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে চার পাঁচ জায়গায় বন্দুকের

গুলির ক্ষতস্থান থেকে পট্টি ভেদ করে তখনো রক্ত ঝরছে। সকলেই জানে যে মাত্র একবছর তাদের বিয়ে হয়েছে এবং সুখিয়া সন্তানসম্ভবা বলেই ঘরে ছিল। কানহু একবার সুখিয়ার মৃতদেহ আরেকবার মংরার দিকে তাকিয়ে সমবেত বিদ্রোহীদের উদ্দেশ করে বলতে লাগল :

"দুশমনেরা মনিষ্যি লয়, উরা জানোয়ার। আয় হামরা কিরা করি দুশমনদের সাজা দিতি হোবে। আওর ফৌজের ঘেরাও থিকে ঔরৎদের বাঁকুড়া, মুঙ্গের আওর দুসরা জায়গায় ভেজতি হোবে। হামি আজ হুকুম দিলম,—তুরা বিষমাখানো তীর দিয়ে হেই জানোয়ারদের ঘায়েল কোরবি। হামরার লড়াইয়ের কায়দা এখুন থিকে খুব সিধা,—ঔরৎদের ইজ্জৎ বঁচাতে হোবে আওর দুশমনদের হায়রান ভি কোরতি হোবে। হামরা ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়ে চারোওর আগলিয়ে থাকব। এখুন থেকে মোঢ়ল মাজি মারা পড়লেও হামরার লড়াই থামবেনি। যি বাঁচবে সি লড়াই কোরবে। আজ ছাড়াছাড়ি হোবার আগে সুখিয়াকে ঘিরে সোবাই একসাথ লড়াইয়ের লাচ লাচব।"

কানহু একলাফে এগিয়ে এসে নিজেই নাচ শুরু করল। তার সাথে সাথে প্রথমে সারি বেঁধে এবং পরে গোল হয়ে জোয়ানদেরও নৃত্য শুরু হল। এ যেন নাচ নয়, এ হচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের সংকল্প গ্রহণ, সর্বজনপ্রিয় সিধুর মেয়ে এবং সব চাইতে সেরা সুন্দরী সাঁওতাল যুবতী সুখিয়াকে ঘিরে সাঁওতাল জোয়ানদের নৃত্যের মধ্যে দিয়ে

দুর্নিবার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষিত হল। রাত্রের লড়াই-এ ক্লান্ত ও জেরবার হয়ে তখন ইংরেজদের ফৌজ বারহাইতের ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করছে।

সায়েবরা ভেবেছিল যে আগস্ট মাসেই বিদ্রোহ খতম হয়ে যাবে। হঠাৎ দেখা গেল যে সমস্ত এলাকা জুড়ে আবার বিদ্রোহীদের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে, তবে এবার বিদ্রোহীরা অনেক বেশী সতর্ক এবং কৌশলী। উপরন্তু তার ইংরেজ ফৌজের ঘেরাও পার হয়ে বহুলাংশে বাঁকুড়া, মুঙ্গে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। কিছু কিছু বিদ্রোহ। ছোট দলে ভাগ হয়ে নদীর অপর পারেও হাজির হল। অবশ্য মূলত বিদ্রোহীরা নিজের এলাকার মধ্যেই গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাতে থাকল।

১৮৫৬ সালের মার্চ মাসের শুরুতে অভ্যাসমত টহল দেবার সময়ে সাঁওতালদের বিষাক্ত তীরের আঘাতে লেফটেনাণ্ট জোন্স এবং তার সব কজন সঙ্গী একত্রে মারা পড়ে। মৃত জোন্সের ডায়েরিতে ফেব্রুয়ারি মাসের চতুর্থ সপ্তাহে শেষ লেখা পাওয়া যায়:

"নাঃ, এই সাঁওতালদের লড়াই সহজে শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা লড়াইয়ের নতুন কায়দা নিয়েছে। ওদের মধ্যে কে লড়াইয়ের পক্ষে আর কে যে পক্ষে নয় তা স্থির করা অসম্ভব। আমার মনে হয় যে যারা লড়াইয়ের বিপক্ষে বলে

ভান করে তারাও গোপনে রাত্রিবেলা বিষাক্ত তীর দিয়ে আমাদের রক্ষীদের হত্যা করে এবং বনে জঙ্গলে বিদ্রোহীদের রসদ জোগায়। চলাফেরা করার সময়ে সদাসর্বদা অনুভব করি যে এই বুঝি বিষাক্ত তীর এসে বিঁধবে। কিছু কিছু বিদ্রোহী আবার বন্দুক পর্যন্ত ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

"সিধু ও কানহু ধরা পড়ায় কর্তারা খুব উল্লাস প্রকাশ করছেন বটে কিন্তু এতে বিদ্রোহ শেষ হবে বলে মনে হয় না। সিধুকে হত্যা করার বিবরণ শুনলাম কিন্তু চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। এমনভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। আমাদের কর্তারা কোনও বিচার করা এমন কি কোর্ট-মার্শাল করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। সিধু সম্পর্কে তাদের এত ভয় যে কোনও বিচার না করেই তাকে হত্যা করা হয়।

"কানহু জামতাড়ার কাছে ওপরবান্ধায় আহত অবস্থায় আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে ধরা পড়ে। তার কোর্ট-মার্শালের সময়ে আমি নিজেই হাজির ছিলাম। সত্যি সত্যিই কানহু এক অদ্ভুত নেতা। আমাদের বিলেতের চার্টিস্ট আন্দোলনের ও'কোনোর প্রভৃতি নেতারা তার তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র আয়তনের ব্যক্তি। কানহুর জবানবন্দীর সময়ে কোর্টমার্শালের সমস্ত চেহারাটাই পাল্টে গেল, বেশ মনে হতে লাগল যে ইংরেজ সেনাপতি অভিযোক্তা আর কানহু অভিযুক্ত একথা নিতান্ত ভিত্তিহীন। কানহুর শেষ কথাগুলো আমার হুবহু মনে আছে। সে তখন দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলছে: হামি দুষী? তুরা হামার বিচার করবি? হেই চারপাশের জমিন

কার মেহনতে পয়দা হয়েছে ? জুয়াচুরি করে হামরার জমিন কে ছিনিয়ে লিছে ? হামরার জুয়ানদের ধরে ঝুটমুট বিনা সবুদে কে সাজা দিছে ? ই মুলুকে হামরার জনম-পয়দা হইয়েছে, হেইখানে চাষের জমিন হামরা বেনিয়েছি, আউর তুরা কি ? তুরা বেইমান। তুরা ইংরেজরা, তুরা জিমিদারেরা, তুরা সাহুকরেরা, তুরা নীলকরেরা, তুরা সোবাই বেইমান। হামরা মেহনত করিয়ে খাই,—হামরা সান্তাল, দিকু, বিহারী এক-সাথ মিল্লত করিয়েছি ; হামরা লিজেদের হক আওর ইজ্জৎ নিয়ে লড়েছি আওর এখুন ভি লড়াই চোলবে। তুরা বিনা বিচারে সিধুকে জানে মেরেছিস আওর ভাবছিস যে বিচারের ভান দেখিয়ে হামার ভি জান লিবি। লড়াই কিন্তুক শেষ হোবেক লেই। শেষমেষ মেহনতী মনিষ,— সান্তাল, দিকু, বিহারীর জিত হোবেই। আওর তেখুন তুদের বিচার হোবে, তুদের সাজা হোবে। তেখুন জমিজেরাত, ঘর-বাড়ি সোব কুছু হোবে আমাদের,—সান্তাল, দিকু আওর বিহারী মেহনৎ করনেওয়ালা মনিষের। সেদিন হামরার লড়াই শেষ হোবে······

"কানহু ও তার দলবলের সবাইকে কোর্টমার্শালের হুকুমে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে কানহুর ভবিষ্যদ্বাণী অমোঘ। অত্যাচারী মহেশ দারোগার মত ভবিতব্য সমস্ত অত্যাচারীর জন্যই এগিয়ে আসছে।"

লেফটেনান্ট জোন্‌সের ডায়েরির শেষ পাতাগুলো তা নিজেরই বুকের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

———